শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যা

Krishna Chandra College
Central Library
Hetampur, Birbhum

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, বীরভূম

উনিশশো সাতানব্বই

॥ শিক্ষা বিস্তারে হেতমপুর ঃ সেকাল ও একাল ॥

—কিশোরীরঞ্জন দাস
অধ্যাপক, কে, সি, কলেজ, হেতমপুর

১৯৫৫ সাল। তখন আমি সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। আমরা কয়েকজন বন্ধু ট্রেনে দুবরাজপুর স্টেশনে নেমে হেতমপুরে বেড়াতে এসেছি। তখন রাস্তা পাকা হয়নি। লাল ধুলোয় আমার পাতলুনের নীচের অংশ লাল হয়ে গিয়েছিল। আমরা স্টেশন থেকে হেঁটেই এসেছিলাম। পথে দুবরাজপুর পেরিয়ে বনের আগে মানসায়ের হোস্টেল (কলেজের ছাত্রাবাস) চোখে পড়ে। তখনও ইউ. জি. সি. হোস্টেল তৈরী হয়নি। রাস্তার দুধারে রাজবাড়ি বা 'হাজারদুয়ারী' পর্যন্ত শাল-মহুয়ার সবুজ ঘন বন তখন ভালো লেগেছিল। বনরেখা যেখানে রাস্তার উত্তরে রাজবাড়ির সীমানায় এসে থেমে গেছে সেখানে 'গৌরাঙ্গবাড়ি' তখন সগৌরবে দৈব-মাহাত্ম্য ও বনপ্রকৃতির সৌন্দর্য মহিমা ঘোষণা করত। আজ আর সে বনও ঘনসন্নিবিষ্ট নয়, গৌরাঙ্গ বাড়িও হৃতগৌরব। পূর্বের সে দেব-বিগ্রহও অপহৃত।

হাজারদুয়ারী এবং তার সুউচ্চ সিংহদুয়ার ও ঘড়িঘর আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। সিংহদরজার অভ্যন্তরে তখন রাজবাড়ীর মুক্ত-প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নানা ফল ফুলের সমৃদ্ধ উদ্যান ছিল নয়নাভিরাম। হাজারদুয়ারীর বিপরীত দিকে লালকুঠিতে (এখন শূন্য প্রাঙ্গন) 'নিউব্লক' ছাত্রাবাস ছিল। ১৯৬৩/৬৪ সালে আমি কলেজের অধ্যাপনা করতে এসে পরে এই ছাত্রাবাসে একত্র বাস করতাম। গ্রামের ভিতরে এসে গোবিন্দ সায়েরের উত্তরপাড়ে বর্তমানে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে এসে পৌঁছেছিলাম। তখন কলেজের ছাত্রসংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। আমরা দূর থেকে তৎকালীন অধ্যক্ষ বি, সি, গুপ্ত মহাশয়ের রাশভারী গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে আর আলাপের সাহস করিনি। তবে মনে মনে ভয় ও শ্রদ্ধা যুগপৎ জেগে ছিল সে কথা আজও ভোলা যায় না। সে-সময় বর্তমান কলেজ বিল্ডিং-এ (মূখ্য) উপরে কলেজ ও নীচের তলায় স্কুলের ক্লাস হ'ত।

১৯৬২ সালে পূজার আগে (সম্ভবত ৫ই সেপ্টেম্বর) আমি কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত হয়ে যোগদান করি। ১৯৬৪ সালে 'নিউ ব্লকে' অবস্থানকালীন বর্তমান হেতমপুর রাইস মিল প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের চারণ কবি সমিতির পূর্বাঞ্চল বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় লেখাজোখার কাজে হেতমপুর গ্রামের স্কুল, টোল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হই। বিভিন্ন সূত্রে—গ্রন্থাদি পাঠে ও প্রাচীন লোকমুখে এই গ্রামের সেকাল ও একালের শিক্ষা ব্যবস্থাও শিক্ষালয়গুলির তথ্যাদি যা জানা গেছে তার বিবরণ দেওয়া গেল—

হেতমপুর গ্রামের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে গড়ের মাঠ বনবিভাগ ও হাফেজ খাঁর বাঁধের মধ্যভাগের ডাঙ্গায় ছোট্ট একটি স্মৃতিমন্দির পীচরাস্তা থেকে দেখা যায়। এই অঞ্চলের কাছা-কাছি হাতেম খাঁ' নামক মুসলিম শাসনকর্তা এখানে এসে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁরই কাছে শেরিনা ও হাফেজ খাঁ নামে দুই তরুণ-তরুণী হাতেম খাঁর কাছে এসে আশ্রয় লাভ করেন। জনশ্রুতি, শেরিনা সম্রাট-দুহিতা ছিলেন। এই হাতেম খাঁ শাসনকর্তার নামানুসারে হেতমপুর গ্রাম নাম হয়। প্রাচীন হেতমপুরের অবস্থান ছিল পার্শ্ববর্তী কেন্দুলা গ্রামের উত্তর-পূর্বে। এই অঞ্চলেই হাতেম খাঁর কবর আছে বলা হয়। তখনকার আমদগঞ্জ, বরকতিপুর, সীতারামপুর, রাধাবল্লভপুর, ধামুড়িয়া, রসিকবাজার প্রভৃতি পল্লীগুলি আজ একত্রে হেতমপুর গ্রামে রূপান্তরিত

Krishna Chandra College Central Library Birbhum

হয়েছে। বর্তমানে গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, পোদ্দার, নাপিত, কলু, নড়ি, ধোপা, বাগদী, ডোম, হাড়ি, বাউড়ি ও মুসলমান প্রভৃতি জাতির মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পাড়া আছে। ১৯১০ সালে গ্রামের লোক সংখ্যা (সেন্সাস্ রিপোর্ট) ছিল আড়াই হাজার (২৫০৬ জন) কিন্তু এখন লোকসংখ্যা আনুমানিক আট হাজার। হেতমপুর রাজস্ববর্ষের জন্যে গ্রামের নাম 'হেতমপুর রাজবাটী' সংক্ষেপে হেতমপুর। গ্রামের উত্তর পশ্চিম অংশে আজও পুরানো 'স্কুল বোর্ডিং' বিরাজমান। 'স্কুল বোর্ডিং' সংলগ্ন প্রধান ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষক মহাশয়ের বাসগৃহ। দুবরাজপুর থেকে রাজবাড়ির পাশ দিয়ে একটি রাস্তা এবং স্কুল বোর্ডিং-এর পাশ দিয়ে আরেকটি রাস্তা এসে বটতলায় মিলিত হয়ে কলেজের পাশ বরাবর হাতীতলা-কদমতলা ও কয়েকটি শিবের মন্দির পেরিয়ে গ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে বড় পীচরাস্তায় গিয়ে মিশেছে ইলামবাজারের পথে। এই হাতিতলা-কদমতলার দক্ষিণে অদূরে পুরাতন রাজবাড়িতে (সরস্বতী ও মনসাবাড়ি সহ) একাংশে বর্ত্তমান হেতমপুর রাজ হাইস্কুল চলে।

এই বিদ্যালয় ১১৫ বৎসর আগে ১৮৬৯ সালে জুলাই মাসে রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী স্থাপন করেন। বিপ্রচরণ চক্রবর্তী ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা। বিপ্রচরণ স্বীয় যোগ্যতা ও অধ্যবসায় ও বুদ্ধিকৌশলে পৈতৃক সম্পত্তির উন্নতি সাধনে দেবমন্দির, জলাশয়, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১২৪৯ সালে কন্যা দোলগোবিন্দমনির নামে 'গোবিন্দসায়ের' খনন করান। এছাড়া বিরজাসায়ের সুখসায়ের, মানসায়ের, লালদীঘি, 'নূতনপুকুর' প্রভৃতি পুষ্করিনীগুলি খনন করান।

তিনিই হেতমপুরে ১২৪০ সালে সরস্বতীপূজার প্রচলন করেন। ১২৫১ সালে গোবিন্দসায়েরে উত্তর পাড়ে 'বড় আটচালা'র উত্তরাংশে একটি সুবৃহৎ সরস্বতীর মন্দির নির্মাণ করান। এই সরস্বতীর মন্দিরটি জীর্ণ হলে সেটি সংস্কার করে ১৮৯৭ সালে সেখানে বর্তমান কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজের বাইরের গেটের পাশে একটি গোলাকার রাসমঞ্চ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। এখন বেদীটুকু বর্তমান, মঞ্চ ভেঙ্গে পড়েছে। উক্ত সরস্বতীর মন্দির বিদ্যামন্দিরে বা কলেজে রূপান্তরিত হওয়ায় তা সার্থক হয়েছে।

গ্রামবাসিদের শিক্ষালাভের জন্যে বিপ্রচরণ ১২৭৫ সালে একটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। সে-সময় থেকে গ্রামে হাটও বসতে শুরু করে। ১২৬৬ সালে কৃষ্ণচন্দ্র পিতার তৈরী মডেল স্কুলটিকে মাইনর স্কুলে পরিণত করেন। পিতার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজা রামরঞ্জন মাইনর স্কুলটিকে ১৮৬৯ সালে এনট্রান্স স্কুলে উন্নীত করেন। ১৯১২ সালে ১৮ই জুন 'Bengalee' পত্রিকায় রাজা রামরঞ্জনের শিক্ষাবিস্তারের জন্য সৎকর্মের প্রশংসা করা হয়—

"The Rajah's beneficence is well-known; and his Zeal for the spuad of education has already made his name a household word in his own district."

হেতমপুরে মানসায়েরে একটি 'চতুষ্পাঠী'ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে গ্রামে একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। জেলায় হেতমপুর রাজ হাইস্কুল (বয়েজ) প্রাচীনতম হাই স্কুল। বহু মেধাবী ছাত্র এই স্কুল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন। স্বনামধন্য আচার্য ৺সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। শতাধিক বৎসর ধরে এই গ্রামটি শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবহন করে চলেছে। এখানকার প্রাচীন উচ্চবিদ্যালয়টি আপন সুনাম অক্ষুন্ন রেখে শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হবে, আশা রাখি।

—):(—

K. Aen, M.A. (Econ.), B.T; DELT,
Hetampur Raj High (H.S.) School.

প্রাককথন

গ্রাম বাংলার প্রচীনতম এই মহাবিদ্যালয় আজ এক বিরল গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে পদার্পণ করল। চীন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দীর্ঘ একশত বছর কাল ধরে জ্ঞানের অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। এ ঞ্চলের ধনী থেকে দরিদ্র এবং দূর-দূরান্তের শহর ও শিল্পাঞ্চলের বহু ছাত্র-ছাত্রী এই মহাবিদ্যালয় থেকে য় ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আজ গর্বভরে বলতে পারা এখান থেকে উত্তীর্ণ অনেকেই সর্বভারতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। পরিশিষ্ট া তার নিদর্শন। বহু শিক্ষকের পদধূলি ও ছাত্রের অধ্যয়ন এই মহাবিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ই ভাবে দীর্ঘ একশতক অতিক্রম করেছে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

আজ এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা তাই শতবার্ষিকী উৎসবের অঙ্গ হিসাবে এই 'স্মরণিকা' প্রকাশে াগী হয়েছি। বর্তমান প্রজন্মের লেখা যেমন আছে, তেমনি এই মহাবিদ্যালয়ের যাঁরা গর্ব ও গৌরব র অমূল্য রচনাও চয়ন করে সংযোজন করা হয়েছে 'অতীতের পৃষ্ঠা থেকে' অংশে। সীমিত সময় ও তার মধ্যে 'স্মরণিকা' প্রকাশ করতে হচ্ছে। যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কিছু ভুল ত্রুটি ক, তা পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন। এতে যে সমস্ত বিদ্বজ্জন লেখা দিয়েছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বাদ জানাই মুদ্রণ সংস্থা এবং অন্যান্য সকলকে যাঁরা এই সংখ্যা প্রকাশে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন। বেদন ইতি –

চন্দ্র কলেজ, হেতমপুর
শে জানুয়ারী, ১৯৯৭

স্বাধীন গুপ্ত
সম্পাদক
শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি

সূচীপত্র

শতবর্ষের আলোকে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ -	ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
আমাদের কলেজ হেতমপুর রাজ কলেজ ও আমার কলেজ জীবন -	ধীরেন সেন
অবিভক্ত গ্রাম বাংলার প্রথম কলেজ -	অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত
হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্মৃতি চারণ -	ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী
হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে চারণ কবি সম্মেলন (১৯৬৪) -	ডঃ কিশোরীরঞ্জন দাশ
উনিশ শতক - বীরভূমের শিক্ষাধারা -	ডঃ রঞ্জন গুপ্ত
সংস্কৃতির বিজ্ঞান ও আমাদের মূল্যবোধ -	ডঃ অসিত দত্ত
In memoriam -	Debabrata Chatterjee
হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের শতবর্ষ উপলক্ষে স্মৃতিচারণ -	পুস্মিতা বিশ্বাস
Hydrogen as an alternative Source of energy -	Prof. Dr Pranabananda Mondal
হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের শতবর্ষে -	আশানন্দন চট্টরাজ
প্রপিতামহকে -	মহঃ ঈশা

পরিশিষ্ট

Reminiscences of Hetampur -	Dr. SriKumar Banerjee.
The Reminiscences of Hetampur-	Prof. L. Mukherjee
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ -	ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
কলেজ স্মৃতিকথা -	শ্রী শিবশরণ চৌধুরী
কলেজ স্মৃতি -	শ্রী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
অন্যান্য তথ্য -	

S. R. BOMMAI

मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत
नई दिल्ली-११० ००१

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
INDIA
NEW DELHI - 110 001

MESSAGE

It gives me great pleasure that the Krishna Chandra College, Hetampur, West Bengal is celebrating the Centenary of its establishment. Krishna Chandra College is one of the oldest educational institutions of West Bengal which has been playing a significant role in dissemination of knowledge. I hope the institution will continue to play this role and also to guide its students in their all-round development, thereby making them an asset to the society.

I send my warm greetings to the Centenary Celebration Committee, Principal, Faculty members and the students of Krishna Chandra College, Hetampur, on the occasion of its Centenary Year Celebration.

(5)

Sd/-(S. R. BOMMAI)

GOVERNOR OF WEST BENGAL

I am glad to know that the concluding ceremony of the centenary celebration of Krishna Chandra College , Hetampur,Birbhum will be held in January , 1997 .

I send my good wishes on the occasion .

(6)

Sd/- (K. V. Raghunath Reddy)
Governor of West Bengal .

Raj Bhavan,
Calcutta,
December 2, 1996

CHIEF MINISTER
WEST BENGAL

No. 176-P/CM
October 17, '96

I am glad to know that Krishna Chandra College, Birbhum is currently celebrating its centenary.

I wish the Celebrations all success.

Sd/- (Jyoti Basu)

Sri Swadhin Gupta,
Secretary,
Centenary Celebration Committee,
Krishna Chandra College,
Hetampur, Birbhum,
PIN - 731124

সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী
মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং - এইচ. ই. এম. এস / ১৮০ / ৯৬

তারিখ ঃ ৩ / ১১ / ১৯৯৬

শুভেচ্ছা

আমি জেনে আনন্দিত হলাম যে হেতমপুর কৃষ্ণ চন্দ্র কলেজের শতবার্ষিকী গত জুন ১৯৯৬ থেকে পালিত হচ্ছে ।

এই উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

সত্যসাধন চক্রবর্ত্তী

স্বাধীন গুপ্ত
সম্পাদক
শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি
কৃষ্ণ চন্দ্র কলেজ
হেতমপুর, বীরভূম ।

सत्यमेव जयते

Direct : 25-8306
ph { : 25-3371
: 25-5601 (Ext.-793)
Rajbhaban (Res.) - 248-6194

Bhakti Bhushan Mandal
Minister- in - charge
DEPARTMENT OF CO-OPERATION
Government of West Bengal
writers' Buildings
Calcutta - 1

Calcutta, the 18th December, 1996.

It gives me immense pleasure to know that KRISHNA CHANDRA College has been celebrating the foundation Centenary since 27th June, 1996. Krishna Chandra College being the oldest one of the learning Centres in the district has been contributing much in enlightening the people of the rural areas of the district of Birbhum with higher education. Of course, full credit goes to the eminent members of the staff -- no doubt.

I wish grand success of the centenary function and convey my heartiest and sincere best wishes to all students, members of the staff & the patrons.

Sd/-(B. B. Mandal)

Shri Swadhin Gupta
Secretary
Centenary Celebration Committee
Krishna Chandra College, Hetampur
Birbhum.

ধীরেন সেন
রাষ্ট্রমন্ত্রী
আবগারী বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলিকাতা ৭০০০০১

তাং ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৬

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ শতবর্ষ উদ্‌যাপন করছে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করছে জেনে খুবই ভালো লাগছে। আমার আরোও ভালো লাগছে এই জন্য যে আমি এই ঐতিহ্যমন্ডিত কলেজের একজন প্রাক্তণ ছাত্র। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল আমি এই কলেজে পড়েছি। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সময়টা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, নেতাজীর অন্তর্ধান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ আমাদের ছাত্র জীবনের ঘটনা। স্মৃতিপথে হাঁটতে গিয়ে ভারত ইতিহাস তোলপাড় করা আরও অনেক ঘটনার কথাই মনে পড়ে।

আমার কলেজ কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ গ্রাম বাংলায় শিক্ষা সংস্কৃতি বিকাশ এবং বিস্তারে বিগত একশ বছর ধরে যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে - আগামী দিনেও সেই ঐতিহ্যের আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলবে - এই দৃঢ় বিশ্বাস আমি রাখি।

ধীরেন সেন

(১০)

শ্রী স্বাধীন গুপ্ত
সম্পাদক
শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ
হেতমপুর

Prof. Ramaranjan Mukherjee
Chancellor

RASTRIYA SANSKRIT VIDYAPEETHA
(Deemed University)
TIRUPATI - 517 507

Residence :
125/1, Santoshpur Avenue
Calcutta - 700 075
Phone : (033) 4724545

I am glad to learn that Krishna Chandra College of Hetampur is going to organise its Centenary Celebration soon. At a time when the District of Birbhum had no Institution to impart instructions in Undergraduate Cources, Hetampur Raj established this premier Institution in the District with facilities for taking care of Undergraduate Programme. Since its inception the College has been catering to the needs of students of the entire Rarh Region, particularly of those who belong to low-income group. The College, thus, has made significant contribution to social development.

The services rendered by a number of teachers, know for their scholarship and dedication and the affection of students for the institutuon has been responsible for its multi-dimensional development. The Institution, which had a humble beginning in the initial years of its existence is now a big Undergraduate College, taking care of Arts, Science and Commerce Streams and imparting instructions in other diversified courses. K. C. College, Hetampur, as a matter of fact, is occupying a prominent position among the College in west Bengal in the last decade of the Twentieth Century.

I am sure the College will thrive further, - will introduce Post-graduate progremmes and ultimately will blossom forth as a great Centre of Excellence in the Country.

Ramaranjan Mukherjee

241-3288
241-0071
241-4984
Telex No. : 021-2752 UNIV IN
Fax No. : 91-33-241-3222

SENATE HOUSE
CALCUTTA - 700 073

Prof. Rathindranarayan Basu
M.Sc. (Ag), Ph. D., (I.A.R.I.), D.Sc. (Cal)
VICE - CHANCELLOR

September 17, 1996

MESSAGE

I am glad to learn that Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum has completed 100 years of its existence and to mark the occasion a souvenir will be published which I am sure, will highlight the achievements of the college in the field of higher education in the State.

I covey my best wishes for the success of the Centenary Celebration of the College.

Sd/- (R. N. Basu)

12

Professor Dilip Kumar Basu
Vice - Chancellor

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
BURDWAN, WEST BENGAL

: Phone :
Office : BDN. { 62900
63-913,63-914, 63-917
63-918, 63-919, Ext. 222
Resi. : BDN. { 62319
63-913, 63-914, 63-917
63-918, 63-919, Ext. 223
Gram : BURDSITY, Fax : 91-0342-64452

No. V/M-4/ 173
November 27, 1996.

MESSAGE

I am happy to learn that Krishna Chandra College, Hetampur, Dist : Birbhum is holding its Centenary Celebration and to mark the occasion, the organisers are contemplating to publish a Souvenir.

On this auspicious occasion I convey my warm wishes to all teachers, students and other staff members of the College and wish every success in their efforts in a publishing a standard Souvenir.

Sd/- (D. K . Basu)
VICE - CHANCELLOR

Shri Swadhin Gupta
Secretary
Centenary Celebrating Committee
Krishna Chandra College
Hetampur
Dist : Birbhum.

(13)

ACHARYA
P. V. NARASIMHA RAO

UPACHARYA
DILIP KUMAR SINHA

VISVA - BHARATI

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

SANTINIKETAN - 731 235
West Bengal, INDIA.
Telephone : (03462) 52-751 (6 lines
Fax : 91-03463 52-672
Telex : 203 201 RABI IN
E. MALL : root @ vbhrat, ernet
Dated - January 5, 1997

No.....

MESSAGE

I am glad to know that the Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum, has completed hundred years of its valuable service to the cause of development of education in the rural areas of West Bengal and earned much reputation, as it is well known to all, in this direction.

I convey my heartfelt greetings to all the students past and present, the teachers and the patrons of the organisation.

(14)

Dilip kumar Sinha
Vice-chancellor
Visva-Bharati

VICE-CHANCELLOR

PHONE : BAGDOGRA { Office : 255
Res. 324

P.O. NORTH BENGAL UNIVERSITY
RAJA RAMMOHUNPUR, DT. DARJEELING
WEST BENGAL, INDIA, PIN - 734430

F. No. 3/259/VC-95

Dated Sept. 11th, 1995

To
The Principal,
Krishna Chandra College,
Hetampur,
Birbhum - 731 124.

Dear Sir,

Received your letter dated 26.08.95 with very many thanks.

I had the fortune to be a student of your college from 1945 to 1947 and I cherish the memory thereof with gratitude and pride.

You are going to celebrate the Centenary of your College next June and in this connection you have invited me to be with you as one of the Patrons of the Celebration Committee.

I consider it to be a matter of honour for me and I sha ll be too glad to be with you as and when you consider my presence necessary.

With regards,

Yours sincerely,

(15) 50

Sd/-(K. N. Chatterjee)
Unfortunately Prof. Chatterjee is no more with us

सत्यमेव जयते

Pranab Mukherjee
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

13, Talkatora Road
New Delhi - 110001
Phone : 3737623
Fax : 3737658

December 25, 1996

Dear Shri Gupta,

I am delighted to know that the centenary year of Krishna Chandra College, Hetampur, Birbhum is being celebrated and that you are also bringing out a Souvenir on this occasion.

Krishna Chandra College is one of the oldest centres of learning which has been imparting education to the rural masses for a century - a laudable feat indeed to be proud of.

On this occasion, please accept my congratulations. I wish you and the members of the Centenary Celebration Committee all success.

With regards,

Yours Sincerely;
(PRANAB MUKHERJEE)

(28)

Shri Swadhin Gupta
Secretary
Centenary Celebration Committee
Krishna Chandra College
Herampur
Birbhum 171 124
(West Bengal)

ব্রজ মুখার্জী
সভাধিপতি,
বীরভূম জেলা পরিষদ

ফোন ঃ সিউড়ী
পি. বি. এক্স. - ৫৫ ৭১২
৫৫ ৭১৩
৫৫ ৩১৯
অফিস - ৫৫ ৪৭২
বাড়ী - ৫৫ ৬৭২

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র রাজ কলেজ শতবর্ষে পদার্পণ করল। ব্রিটিশ আমলে রাজা মহারাজাদের অর্থানুকূল্যে মফঃস্বলে যে সব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি তাদের অন্যতম। শতবর্ষ ধরে এ জেলা ও পার্শ্ববর্তী অনেক অঞ্চল এই কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ করেছে।

মহাবিদ্যালয়টি কৃতিত্বের সাথে এগিয়ে চলেছে। জেলা, রাজ্য ও দেশবাসী আমরা গৌরবান্বিত।

নিরক্ষরতার গ্লানি নিয়ে স্বাধীনতার পঞ্চাশতম বর্ষে আমরা প্রবেশ করছি। সারা পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক বছর ধরে এই গ্লানি দূর করতে সাক্ষরতা আন্দোলন চলছে। সর্বসাধারণের দ্বারে শিক্ষাকে নিয়ে যাওয়াই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। শুধুমাত্র কিছু মানুষ নয়, সর্বসাধারণকে সাক্ষর, সক্ষম ও সচেতন করাই উদ্দেশ্য। দেশের অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি ও সর্বসাধারণের শিক্ষা সচেতনতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ জেলায়ও এই কর্মসূচী ব্যাপকতা লাভ করেছে।

নিরক্ষরতার গ্লানি থেকে এ জেলার সব মানুষকে মুক্ত করব, মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ব্রজ মুখার্জী
সভাধিপতি,
বীরভূম জেলা পরিষদ

(19)

Dr. Ramchandra Dome
Member of Parliament
(Lok Sabha)

Address :-
Sarojini Palli, P.O. Suri,
Dist. Birbhum (W.B)
Phone : 03462 - 55636

422, V. P. House,
Rafi Marg, New Delhi -
110001
Phone - 3712554

মাননীয় অধ্যাপক গুপ্ত,

বীরভূম জেলার অন্যতম আদি মহাবিদ্যালয় ' হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ ' শতবর্ষে পদার্পণ করেছে জেনে বীরভূমবাসী হিসাবে গর্বিত । এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে প্রতিপালন করার জন্য ' হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র মহাবিদ্যালয় শতবর্ষ উদযাপন কমিটি ' বর্ষব্যাপী যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হ'লাম । এতদুপলক্ষে প্রকাশিতব্য 'স্মরণিকা'-র সাফল্য কামনা করছি ।

সর্বোপরি জেলার অন্যতম ঐতিহ্যশালী এই মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্য কামনা করছি ।

ধন্যবাদ ও নমস্কারান্তে,
ভবদীয় -
ইতি -
ডাঃ রামচন্দ্র ডোম

শ্রীযুক্ত স্বাধীন গুপ্ত,
অধ্যক্ষ ও সচিব
হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
পোঃ - হেতমপুর,
জেলা - বীরভূম

(২০)

KALIM SHARAFI
কলিম শরাফী
39, Circular Road, Siddhashwari, Dhaka 1217, Bangladesh
Phone : 405826

29.9.95

The Principal,
Hetampur Krishna Chandra College
Hetampur, Dt. Birbhum, W.B

Sir,

It was a pleasant surprise to receive your most unexpected letter. I had Spent some happy and fruitful days at the Hetampur College, and had the rare opportunity of being taught by renowned teachers, one of them being the great scholar, Professor L. Mukherjee. Memories of the past still lingers in my mind.

That, after nearly five decades my alma mater remembers an humble being like me is a great honour. I am grateful to you. Sir, for offering me this previledge of being with you for the Centenary Celebrations.

However, as the Celebration are a long way off, it is difficult for me to be absolutely positive regarding my participation. You can, however , count on my being with you if everything works out smoothly at my end.

With best regards,

Yours Sincerely

Sd/- (KALIM SHARAFI)

21

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ-

ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	আচার্য, তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	সাংসদ
শ্রী ধীরেন সেন	মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ
শ্রী ব্রজ মুখোপাধ্যায়	সভাধিপতি, জেলা পরিষদ
শ্রী সুধীর করণ	লোক সংস্কৃতি গবেষক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ
শ্রী গোপালগোবিন্দ মজুমদার	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ
শ্রী নেপাল মজুমদার	রবীন্দ্র গবেষক
ডঃ জ্যোতিকুমার সেনগুপ্ত	অধ্যাপক, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য নোবেল কমিটি
কলিম শেরাফী	রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, বাংলাদেশ
শ্রী তপন রায়	প্রাক্তন রাষ্ট্রমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ডঃ স্বামী কৃষ্ণানন্দ	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়
শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	প্রাক্তন বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট
ডঃ জীমূতবাহন ভট্টাচার্য	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বীরভূম মহাবিদ্যালয়
শ্রী মাধবীরঞ্জন চক্রবর্তী	সদস্য, পরিচালক সমিতি
শ্রী সুরঞ্জন চক্রবর্তী	"
ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতি ঃ শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল, সমবায় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সম্পাদক ঃ অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত

সদস্য ঃ অধ্যাপক প্রেমপ্রকাশ চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা অলকা সিদ্ধান্ত, শ্রী বৈদ্যনাথ মন্ডল, অধ্যাপক আব্দুল হাফিজ, অধ্যাপক নীরোদবরণ পাল, ডঃ অমিয়ভূষণ বিশ্বাস, শ্রী সিদ্ধময় চট্টরাজ, শ্রীকান্ত দাস, মহঃ হাফিজ রহমান, শ্রী মানিক ব্যানার্জী, শ্রী শ্যামনারায়ণ ব্যানার্জী, শ্রী প্রহ্লাদ রুদ্র, শ্রীমতি নিবেদিতা দত্ত, শ্রীমতি স্নিগ্ধা রায়, সাধন ঘোষ, শ্রী পীযূষ পান্ডে, ডাঃ প্রভাত কুমার মিত্র, ডাঃ আঞ্জনা মুখার্জী, ডাঃ তাপস দাস, শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী, শিবদাস মুখার্জী, ডাঃ বিদ্যুৎবরণ দে, ডাঃ এস. পি. মিশ্র, মহঃ ইদ্রিশ, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপসমিতি

সাংস্কৃতিক উপসমিতি ঃ

যুগ্ম আহ্বায়ক - অধ্যাপক মহঃ আব্দুল হাফিজ ও অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ গাঙ্গুলী।

সদস্য - অধ্যাপক গুণধর মন্ডল, ডঃ রাধানাথ আচার্য, ডঃ মহম্মদ আলাউদ্দিন, শ্রী বৈদ্যনাথ মন্ডল, ডঃ অশোককুমার মল্লিক, অধ্যাপিকা স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা চৌধুরী, ডঃ অমিয়ভূষণ বিশ্বাস, মহঃ ঈশা, পবিত্রকুমার সরকার, সমরেন্দ্র নাথগুপ্ত, জয়দেব চ্যাটার্জী, পরিমলকুমার ঠাকুর, ফাল্গুনী পাল।

স্মারক উপসমিতি ঃ

যুগ্ম আহ্বায়ক - ডঃ মহম্মদ আলাউদ্দিন ও অধ্যাপক রণজিত সেনগুপ্ত

সদস্য - ডঃ রাধানাথ আচার্য, অধ্যাপক স্বপনকুমার দে, অধ্যাপক নীরদবরণ পাল, অধ্যাপক দেবাশিস দাস, অধ্যাপক অসীম চট্টরাজ, অধ্যাপিকা স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, ডঃ অলকা সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনির্বাণ বিশ্বাস, অধ্যাপক তরুণকুমার দাস, মহঃ ঈশা, অধ্যাপক আশিসকুমার চক্রবর্তী, আশানন্দ চট্টরাজ ও কবিরুল ইসলাম।

প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন উপসমিতি ঃ

যুগ্ম আহ্বায়ক - অধ্যাপক নীরোদবরণ পাল ও শ্রী পবিত্র সরকার

সদস্য - অধ্যাপক বসন্তকুমার রায়, অধ্যাপক ষষ্ঠীধর মন্ডল, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মন্ডল, ডঃ কল্যাণ কুমার পাল, ডঃ দেবনারায়ণ মুখার্জী, মহম্মদ ঈশা, পবিত্র সরকার, পরমানন্দ দত্ত, ফাল্গুনী মুখার্জী, মোহনলাল দত্ত, শ্রীকান্ত দাস, ধর্মদাস চ্যাটার্জী, পরিমল ঠাকুর, সিন্ধুময় চট্টরাজ, শরৎ পাল, চঞ্চল সুত্রধর ও মহঃ হাফিজুর রহমান।

আপ্যায়ন উপসমিতি ঃ

যুগ্ম সম্পাদক - শ্রী জয়দেব চ্যাটার্জী ও পরিমল ঠাকুর

সদস্য - অধ্যাপক গুণধর মন্ডল, অধ্যাপক ষষ্ঠীধর মন্ডল, ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মন্ডল, অধ্যাপিকা স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা চৌধুরী, অধ্যাপক দেবাশিস্ দাস, অধ্যাপক কৃষ্ণকুমার মন্ডল, ডঃ প্রণবানন্দ মন্ডল, দেবাশিস চ্যাটার্জী, ফাল্গুনী মুখার্জী, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মোহনলাল দত্ত, ক্ষীরোদ ভান্ডারী ও মহম্মদ শহিদুল ইসলাম।

প্রদর্শনী উপসমিতি ঃ

যুগ্ম আহ্বায়ক - ডঃ অশোককুমার মল্লিক ও ডঃ অমিয় ভূষণ বিশ্বাস।

সদস্য - ডঃ আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপিকা স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা কৃষ্ণা চৌধুরী, শ্রীকান্ত দাস, গৌসাই দাস ও কাঞ্চন মাজি।

স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতি ঃ

যুগ্ম আহ্বায়ক- শ্রী পবিত্র সরকার ও পরমানন্দ দত্ত

সদস্য - শ্রীমতি সুমিতা ঘোষ, সুধীর দাস, বিশ্বনাথ দে, উজ্জ্বল ভান্ডারী, শরৎ পাল, পার্থ ব্যানার্জী ও লিপিকা দে।

অনুষ্ঠান সূচী

২৮. ১. ৯৭ — শতবার্ষিকী দৌড়, প্রদর্শনী উদ্বোধন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকসজ্জা।

২৯. ১. ৯৬ — রক্তদান শিবির, আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৩০. ১. ৯৭ — প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী সম্মেলন, আলোচনাচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শতবর্ষের আলোকে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কাহার ভাবনা রূপ দিল তোমা
শতবরষের আগে
তাহারি চেতনা সুষমা আজিকে
বার বার মনে জাগে।
উচ্চ-বিদ্যা-পীঠ তো ছিল না,
এ রাঢ় বঙ্গ মাঝে
মিটাতে জ্ঞানের তৃষ্ণা সাজালো
এ পিঠেরে নব সাজে।।
শতবরষের আলোকে উজল
এ বিদ্যানিকেতনে।
দেখিলে তাই তো আসে বার বার
তাহারি স্বপন মনে।।
এসেছে গিয়েছে কত প্রাকার্য,
কত না ছাত্র দলে।
দিয়েছে তোমারে নব নব রূপ
নূতন মাল্য গলে।।

* * *

চল্লিশে যবে প্রথম দেখেছি
তোমায় উদার রূপে,
স্বপ্নসীবন করে গেছি প্রিয়
মনোবণে চুপে চুপে।।
তোমাতে দেখেছি তক্ষশীলারে,
প্রথিত নালন্দারে।
বিক্রমশীলা-বিহারে দেখেছি
তোমাতে যে বারে বারে।।
ভূপেনে-নিখিলে শরতে ও শিবে
তারকে জটিলে মিলি,
লাবণ্যলাল আর অবিনাশে মন্ত্র
যে দিল তুলি;
তারই সৌরভে জীবনপাত্র
আজও হয়ে আছে পূর্ণ।
সকল বিদ্যাপীঠের দর্প
সেদিন করেছো চূর্ণ।।
ছিল না বিজ্ঞাপণের বাহার,
ছিল না বাহিরে শোভা
তবু জ্বেলেছিলে সুসংস্কৃতির
দীপশিখা মনোলোভা।

কারে বলে প্রিয় শিক্ষাস্বরূপ,
কারে প্রাকার্য বলে,
জ্ঞানের বৃত্ত কেমনে পূর্ণ -
হয় পাদপীঠ তলে,
বিকশিত হয় কেমনে চিত্ত
কেমনে বুদ্ধি জাগে;
কেন বা তৃষিত আত্মা মুক্তি
অসীমের কাছে মাগে?
কেন সীমা ফিরে অসীমেরে খুঁজি,
কেন অনন্ত কাঁদে;
কেন বা অসীম ধরা দেয় নিজে,
সীমার লোভন ফাঁদে?
বিশ্বসাগর কেন বা উথলি
ঢেউ দিয়ে যায় তুলি,
কখন হে প্রিয়, কাহারি পরশে
সব ঘর যায় খুলি?
তব নিকেতনে শিখেছি এসব
পেয়েছি নূতন আলো
নূতন তৃষ্ণা, নূতন দৃষ্টি
ঘুচেছে মনের কালো।।
অতলান্তিক স্মৃতির সাগরে
তাই তো তোমারে খুঁজি;
অবক্ষয়ের মাঝারে সে স্মৃতি
ব্যথারে মুছাবে বুঝি।

* * *

তারপর গেছে অর্ধশতক,
এসেছে নতুন ধারা;
কালচক্রের আবর্তনেতে
পুরাতন হল হারা।
নব পাঠক্রম, নব প্রক্রিয়া
এসেছে এসব জানি;
বাহিরের শোভা হয়ে মনোলোভা
গুণীরে এনেছে টানি।
তবু এ প্রশ্ন এ বিদ্যাপীঠ
রেখেছে কি তার প্রাণে
আজো কি জুড়ায় তৃষিত হৃদয়ে
প্রশান্ত কলতানে?

আজো আছে কিবা সেই ভালবাসা
প্রাণে প্রাণে মনে মনে,
প্রেম ও প্রীতির গন্ধি গোলাপ
ফুটিতেছে মনোবনে?
আজো কি একের হাসিতে, হে প্রিয়
অপরের ফুটে হাসি,
একের দুঃখ অপরের বুকে
বাজে বেদনার রাশি?
আজো শিক্ষকে শিক্ষিতে মিলি
তুলে 'সহ নৌ' ধ্বনি
একই সুরে বাঁধা হৃদয় তন্ত্রী
উঠে কিগো অনুরণি?
হয়তো বা আছে, নয়তো বা নেই
এতো ভেবে কিবা হবে
আমার মনের স্মৃতি বন্ধনে
চিরদিন একই রবে
শত সূর্যের কিরণে দীপ্ত
তোমার চরণে প্রিয়;
বিনম্র নতি জানাই সোহাগে
আদরে তুলিয়া নিও।।

—

আমাদের কলেজ হেতমপুর রাজ কলেজ
ও আমার কলেজ জীবন।

ধীরেন সেন, (প্রাক্তন ছাত্র)

এ বৎসর আমাদের কলেজ নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার শতবর্ষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত করে চলেছে। সেই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে আমার এ লেখা। কলেজের আসল নাম - কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, তবে শিরোনামে ব্যাপক পরিচিতি ছিল, বোধ হয় আজও আছে। গ্রাম বাংলার উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এই মহাবিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য।

আমার কলেজ জীবনের শুরু ও সমাপ্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ১৯৪০ - ৪৪ খৃঃ। ১৯৩৯ খৃঃ-এর ১ লা সেপ্টেম্বর ২য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। পরবর্তী বৎসরগুলিতে তৎকালীন ভারতবর্ষ নানা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনায় সমৃদ্ধ। সেসময় উত্তেজনার মধ্যে আমাদের কলেজে পাঠজীবনের শুরু। আমরা অধিকাংশ ছাত্রেরা পড়াশুনার চেয়ে সে সময়ে দেশে সৃষ্ট চাঞ্চল্যকর ঘটনায় বেশী আকৃষ্ট হতাম। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ ঃ-

(১) ১৯৪০ এ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের কংগ্রেস ত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন।

(২) গান্ধীজীর আহ্বানে সাড় দিয়ে হাজার হাজার নরনারীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে কারাবরণ।

(৩) ১৯৪১ এ ইংরেজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নেতাজীর দেশত্যাগ।

(৪) ঐ বৎসরই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ।

(৫) ঐ বৎসর এর শেষের দিকে কলিকাতায় জাপানীদের বোমা বর্ষণ ও অধিকাংশ বাসিন্দাদের কলিকাতা হইতে পলায়ন।

এসব ঘটনা আমাদেরকে পাঠ বিমুখ করে দিয়ে এই পরিস্থিতির মূল্যায়ণ করতে বসতে হতো। আমরা ছাত্রেরা এই পরিস্থিতিতে আমাদের ইতি কর্ত্তব্য নির্ধারনের চেষ্টা করতাম।

এরই মধ্যে "ইংরেজ ভারত ছাড়ো" এই ডাক দিলেন গান্ধীজী ৪২ -এর ৯ ই আগষ্ট। পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির আহ্বান "Do or Die" । আপামর ভারতবাসি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে পিছপা হননি। নেতাদের সহিত হাজার হাজার ভারতবাসী আত্মবলিদানে পিছপা হননি। সে এক উত্তেজনার মুহূর্ত - চারিদিকে এক আওয়াজ - Quit India - ইংরেজ ভারত ছাড়ো। পড়াশুনা বন্ধ - কলেজ বন্ধ । এই কলেজের ছাত্ররাও পিছিয়ে ছিলেন না। কলেজের কিছু ছাত্রও কারাবরণ করলেন। সবার নাম মনে নাই - দুজনের নাম মনে পড়ছে - একজন শ্রী সিদ্ধেশ্বর মন্ডল - পরবর্তীকালে - পঃ বঙ্গ বিধানসভার সভ্য হয়েছিলেন। অন্যজন হলেন শ্রী বারিদবরণ রায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবার কলেজে পড়াশুনা শুরু হল। ইতিমধ্যে জাপান ইংরেজের মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে। যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটে চলেছে। যুদ্ধে লোকবল চাই। ভারতবাসী এই যুদ্ধে সাহায্য করতে নারাজ। ইংরেজের কূটবুদ্ধি 'ভাতে মারো' - তবে ভারতবাসী যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হবে। তদানীন্তন বঙ্গে সৃষ্টি করা হল 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' (১৯৪৩) । লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যু বরণ করলো, অনেকে বাধ্য সেই মহাযুদ্ধে যোগদান করতে। ইতিমধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস জাপনের সাহায্যে সেখান হতে ইংরেজ / মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েছেন। উক্ত পরিস্থিতির মধ্যে আমার কলেজ জীবনের পরিসমাপ্তি । এবারে আমি কলেজের ছাত্র জীবন ধারায়,।

তৎকালে দুটি ছাত্রাবাস ছিল - একটা 'মানসায়ার' অন্যটি 'গিরি ডাঙ্গাল' নামে অভিহিত। দুটিই হেতমপুর গ্রামের দুই প্রান্তে অবস্থিত। আমি মানসায়ার ছাত্রাবাসে ৪ (চার) বৎসরই কাটিয়েছি। সুন্দর পরিবেশ, গ্রাম্য আবহাওয়া - সুন্দর সুদীর্ঘ শাল বৃক্ষ পরিবেষ্টিত।

বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, সাঁওতাল পরগণা ও সুদূর মালদহ জেলা হতে সাধারনতঃ ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতেন। খেলার মাঠ হষ্টেলের পাশেই, Recreation বলতে খেলাধূলাই। অধ্যাপকগণ মাঝে মধ্যে এখানে আসতেন। বিশেষভাবে সরস্বতী পূজায় সকলেই যোগদান করতেন। সরস্বতী পূজায় হেতমপুর গ্রামের পরিবেশ পাল্টিয়ে যেত। গ্রাম উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠতো - কলিকাতার নামজাদা থিয়েটারের দল, প্রসিদ্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেব বর্মণ, নামজাদা যাদুকর পি, সি,

সরকার, ঝুমুর, লেটোগান, বিখ্যাত কবিয়াল - গুমানি ও লম্বোদর চক্রবর্তীর কবিগান গ্রামকে আনন্দে ভরিয়ে দিতো। আমরা ছাত্রেরাও মেতে উঠতাম। এক সপ্তাহ ধরে উৎসব চলতো।

পরিশেষে - আসি কলেজের পরিবেশ সম্বন্ধে ঃ অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ সকলেই ছাত্রদের অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অধ্যাপকগণ অতিশয় যত্নের সাথে ক্লাস নিতেন। অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত বেশ রাশভারী ব্যক্তি ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁকে ভয় ও ভক্তি দুইই করতেন। মনে পড়ে সেই সব অধ্যাপকগণের কথা - সকলের নাম মনে নেই। তার মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়ছে, শ্রদ্ধার সহিত তাঁদের নাম মনে করছি - ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী লাবণ্য মুখার্জী, ইংরাজীর অধ্যাপকদ্বয় শ্রী শিবশরণ চৌধুরী ও শ্রী শরৎ সেন, অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রী সত্যকালী মুখার্জী ও সংস্কৃতের অধ্যাপকদ্বয় শ্রী অবিনাশ শাস্ত্রী ও শ্রী মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ। জানিনা এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিত আছেন কিনা। তবে এঁদের শিক্ষাদান আমাদের জীবনের পথ নির্দেশক হয়ে আজও চলেছে।

কলেজ জীবনের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করছি। সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রী মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎকালীন পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁকে নিয়ে একটু রসিকতা করার চেষ্টা করতো। ছাত্ররা তাঁর একটা অন্য নাম বহুদিন পূর্ব হইতেই চালু করেন। সে নামটা হ'ল 'ভকাম'। ভট্টিকাব্যগ্রন্থের নামের - 'ভ', 'কাদম্বরী' এর 'ক' ও মনুসংহিতার 'ম' - এই গ্রন্থগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে এই নামের সৃষ্টি। উক্ত নামেই কলেজে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি। ছাত্রেরা এ নামে তাঁকে নিয়ে পশ্চাতে বিদ্রুপ করতেন। একদিন আমাদের 'class' এ ক্রোধে তিনি একটু কটু ও অশালীন কথা বলে ফেলেন। ছাত্রেরা তাঁর ক্লাস বয়কট করেন। হঠাৎ দেখি সবছেলের অভিভাবকগণ কলেজে হাজির। কি ব্যাপার ? অধ্যক্ষ সব ছাত্রদের অভিভাবকগণকে জানিয়ে দিয়েছেন - ছাত্রেরা শালীনতা শিখুক, নচেৎ এই বিদ্যাপীঠ পরিত্যাগ করুক। সব ছাত্রগণ অভিভাবকের উপদেশে অধ্যাপকের নিকট ত্রুটি স্বীকার করে মার্জনা প্রার্থনা করেন। কলেজে আবার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হ'ল। বর্তমানে এ ধরনের আচরণ অধিকাংশ বিদ্যাপীঠে অকল্পনীয়। আজ আমাদের কলেজ অনেক বড় হয়েছে - আমাদের সময়ের চাইতে দশগুন ছাত্র বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু সমাজ ছাত্রদের কাছে যা চায়, তা পায় কি ? শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা, নিজেদের প্রতি নীতি বোধ, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি দেশাত্মবোধ- এর 'স্ফুরণ' অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলে কি? যে মানসিকতা আমাদের সময় ছাত্রদের মধ্যে পাওয়া যেতো - সেটা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ছাত্রসমাজ এ সম্বন্ধে ভাবছেন কি? ভাবুন নিজেকে সেভাবে তৈরী করুন এই আবেদন রেখে আমার ছোট্টো লেখার পরিসমাপ্তি।

[* প্রবন্ধকার বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী]

অবিভক্ত গ্রাম বাংলার প্রথম কলেজ

অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত

১৮৫৪ সালের চার্লস উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রথমটি হ'ল সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা ও দ্বিতীয়টি হ'ল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে "Grant-in-aid" ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা। এই ব্যবস্থায় [illegible] ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি লক্ষ্য করা যায় নি। অপরদিকে [illegible] হস্তক্ষেপের ফলে বেসরকারী উদ্যোগগুলি ক্রমশঃ হীনবল [illegible] পড়ে। ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন নিযুক্ত ভারতের প্রথম [illegible] কমিশন (হাণ্টার কমিশন) প্রচলিত সরকারী শিক্ষানীতির [illegible] করে, এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ [illegible] সুপারিশ করে। ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে [illegible] সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ১৮৮৩ সালের [illegible] থেকে ভারতীয়গণ উচ্চ শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। [illegible] ১৮৮১-৮২ সালে দেশী এবং বিদেশী সংস্থা পরিচালিত কলেজের [illegible] ছিল যথাক্রমে ৫ এবং ১৮। পরবর্তী দুই দশকে এই [illegible] বাড়তে শুরু করে। ১৯০১-০২ সালে ভারতীয়দের ও [illegible] ভারতীয়দের পরিচালিত কলেজের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২ ও [illegible]-এ দাঁড়ায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের পিছনে মূল কারণ ছিল [illegible] জাতীয় জীবনে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা। বাংলার [illegible] নেতৃবর্গ উপলব্ধি করেন যে ইংরাজদের করুণা [illegible] অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি [illegible] সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার [illegible] দেশজুড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে ব্রতী [illegible] এর ফলশ্রুতি স্বরূপ এই সময়ে সারাদেশ জুড়ে ভারতীয় [illegible] স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। অত্যন্ত [illegible] কথা যে বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের একটি বিরাট [illegible] এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। দেশের শিক্ষানুরাগী [illegible] শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্যে বেশ কিছু শিক্ষা [illegible] গড়ে ওঠে। সে তুলনায় জেলার কেন্দ্রে একটি জেলা [illegible] ও একটি বাংলা স্কুল ছাড়া অন্য কোনো সরকারী শিক্ষা [illegible] গড়ে ওঠে নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তদানীন্তন নবজাগরণ প্রসূত [illegible] প্রসারের কার্যকলাপ মূলতঃ হুগলী ও কলিকাতা অঞ্চলেই [illegible] ছিল। কিন্তু বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষা প্রসারের [illegible] অনুভব করা যায় নি। যদিও আলোচ্য সময়ে পাশ্চাত্য [illegible] অর্থনৈতিক মূল্য ও চাহিদা দুই-ই ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আগ্রহও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রের একান্ত অভাব ছিল। বস্তুতঃ গ্রামাঞ্চলের ছাত্রদের পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ছিল না। স্বল্প আয়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা নিতান্তই কল্পনাবিলাস ছিল। ভাবতেও অবাক লাগে যে এমনি এক যুগে বীরভূম জেলার হেতমপুর গ্রামে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। এই উদ্যোগ আসে হেতমপুরের রাজপরিবারের (জমিদার) কাছ থেকে। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি জমিদার শ্রেণী বা রাজপরিবার কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেমন — বর্ধমান কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, বহরমপুর কলেজ, কোচবিহার কলেজ, রংপুর কলেজ। কিন্তু এগুলি সবই শহরে প্রতিষ্ঠিত। গ্রামে কলেজ স্থাপন শুধু বাংলাদেশে নয়, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে প্রথম হেতমপুরেই সম্ভব হয়েছিল। এই সময় সমগ্র বীরভূম জেলায় মাত্র চারটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, তার মধ্যে ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হেতমপুর "রাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়" অন্যতম। হেতমপুরের পাশে দুবরাজপুরেও কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না।

১৩০৩ সাল (ইংরাজী ১৮৯৬) হেতমপুর গ্রামের রাজ পরিবারের মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী তাঁর স্বর্গত শ্বশুরের নামানুসারে "কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ" প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে "ব্রজবালা ট্রাষ্ট" নামে একটি নির্দেশপত্রও তিনি সম্পাদন করেন, যার মুখবন্ধে বলা আছে, "তদ্ভিন্ন এই প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ না থাকায় এদেশস্থ বালকগণ বিদ্যাধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়া ইতিপূর্বে জ্ঞানলাভে বঞ্চিত ছিল। স্বামী মহাশয় দেশের উপকারার্থে উচ্চশ্রেণী ইংরাজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী টোল এই হেতমপুর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে বহু বহু বালকসকল অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নিকটে উচ্চ শিক্ষার স্থান না থাকায় তাহারা উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন না জন্য আমার সম্পূর্ণ মন ঐ সকল বালক ও দেশস্থ অন্যান্য বিদ্যালয়ের বালক সকলকে বিদ্যাদান অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা দেওন জন্য একটি কলেজ স্থাপন করি এবং তাহা করিবার কল্পনা স্থির করিয়াছি।"[৩]

এই কলেজ যাতে অর্থাভাবে অভাবগ্রস্ত না হয়, তার উদ্দেশ্যেও তিনি নির্দেশ লিপিবদ্ধ করেন।

"(২) দফায় লিখিত সৎকার্য্য সকল চিরকাল স্থায়ী থাকে এজন্য স্বামী মহাশয়ের প্রদত্ত (ক) তপশীলের সম্পত্তি এবং নিজ স্বত্বীয় (খ) তপশীলের সম্পত্তি সকল ঐ সকল কার্য্যে

এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে সকলের ব্যয় জন্য একটি ট্রাষ্ট অর্পণ করিলাম ও তাহা ঐ সকল কার্য্যের জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি হইল এবং ঐ ট্রাষ্ট সম্পত্তি শ্রীশ্রীকৃষ্ণমোহিনী রাধিকা দেবীর অন্যতর নাম "ব্রজবালা" নামে খ্যাত হইবে অর্থাৎ "ব্রজবালা ট্রাষ্ট স্টেট" বলিয়া খ্যাত হইবে।[৬]

ঐ নির্দেশপত্রে আরও উল্লিখিত হয়, "আমি দেশস্থ বালকদিগের অধ্যয়ন জন্য আগামী বর্ষের প্রথম হইতে কলেজ স্থাপন করিব। ঐ কলেজ আমার পূজ্যবর শ্রীশ্রী ৺শ্বশুর মহাশয়ের নামে অর্থাৎ "কৃষ্ণচন্দ্র" নামে খ্যাত হইবে তাহা উদ্যোগ করিতেছি।"[৭] পদ্মসুন্দরী ব্রজবালা ট্রাষ্টকে ৬৬,১৮০ টাকার সম্পত্তি দান করেন। এই আয় থেকে পূজা, উৎসব, অতিথি সেবা ও কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়।[৮]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো ক্যালেন্ডার থেকে জানা যায়, হেতমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে। প্রথমে এফ এ পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া যায়। হয়তো সরকারীভাবে অনুমোদন পেতে বা আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে বিলম্ব ঘটে। তাই পরবর্তী ক্যালেন্ডার থেকে জানা যায় যে কলেজ প্রতিষ্ঠার দিন ১৮৯৭ সালের ২৭শে জুন। হেতমপুর জমিদার পরিবারের বিপ্রচরণ নির্মিত (১২৯১ সাল) বড় আটচালার উত্তরদিকে যে সুবৃহৎ সরস্বতী মন্দির ছিল তা সংস্কার করে তারই মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] একই বাড়ীর নীচের তলায় এন্ট্রেন্স স্কুল এবং ওপর তলায় কলেজ বসত।[১০]

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠায় মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। পরাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থা বিদেশী সরকারের দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করত। সেই সময় গ্রামের এই মহিলার এত বড় উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পদ্মসুন্দরীর সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রেরিত এক রিপোর্টে কানিং লিখেছেন — "It is very charming to hear of the foundress Maharani to whom the idea and the endowment of the college are entirely due..... This subjected women actually invested her whole property in that education which was to bring about the salvation of her country."[১১]

অবিভক্ত বাংলায় হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের স্থান ছিল ২৩-তম। ১৯৩০ সালে হেতমপুরের কাছাকাছি কলেজ বলতে একমাত্র বর্ধমান রাজ কলেজ ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩০, ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সালে কলেজের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২, ৬২ এবং ৭১।১ ১৯৪৮ সালে বিভক্ত বাংলায় কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৩। বিভক্ত বাংলায় কালানুক্রমে এই কলেজের স্থান ছিল ১৩।[১২] ১৮৯৭ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত প্রথমে এফ এ ও পরে আই এ পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। অনুমোদিত পাঠ্য বিষয়গুলি ছিল বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষার বিলোপ সাধন এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এর ফলে ১৯২৩ সালে হেতমপুর কলেজে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, দর্শন ও ইতিহাস সহ বি এ পাস কোর্স পড়ানোর অনুমোদন লাভ করে। ১৯৪০ সালে আই এ ক্লাসে পৌরনীতি এবং ১৯৪৫ সালে আই এসসি কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৪৬ সালে বি এ ক্লাসে অর্থনীতি পড়ানোর অনুমোদন পাওয়া যায়। ১৯৫৮ সালে বি এসসি পাঠক্রম অনুমোদিত হয়। ১৯৬০ সালের ১লা জুন থেকে কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসে।

জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হেতমপুর কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা ছিল। হেতমপুর হাই স্কুল থেকে পাস করা সর্বাধিক নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে মাসে পাঁচ টাকা আট আনা হারে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এছাড়া বিনা বেতনে বা অর্ধবেতনে পড়ার ব্যবস্থা ছিল। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বহন করতেন। ১৯৪০ সালে মাসিক ১০ টাকা হারে একটি সরকারী বৃত্তি চালু হয়। এছাড়া এক বছর অন্তর আরেকটি সরকারী বৃত্তিও প্রবর্তিত হয়। আই এ এবং বি এ ক্লাসের মাসিক টিউশন ফি ছিল যথাক্রমে চার টাকা আট আনা ও ছ' টাকা আট আনা। ১৯৩০, ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সালে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০০ থেকে ১২৫, ১৩৫ থেকে ১৮৫ এবং ১৮০ থেকে ২০০। কলেজে কোনো মহিলা ছাত্রী ছিল না।[১৩]

ছাত্রদের জন্য গ্রন্থাগার ও কমন রুমের ব্যবস্থা ছিল। কলেজে "সাহিত্যসভা" ও "বিতর্কসভা" আয়োজন করার জন্য "কলেজ লিটারারী সোসাইটি" এবং "ডিবেটিং ইউনিয়ন" ছিল।[১৪] (ক) কলেজের দোতলায় একটি লম্বা হলঘর কমনরুম রূপে ব্যবহৃত হোত। এখানে বাংলা সংবাদপত্র অথবা মাসিকপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। শোনা যায় দেশীয় সংবাদপত্র পাঠ করলে ছাত্রগণ জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এই আশঙ্কায় কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐসব পত্রিকা ছাত্রদের দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না।[১৫] তাই কমনরুমে "স্টেটসম্যান" পত্রিকাই দেওয়া হোত। ছাত্ররা অবশ্য "আনন্দবাজার" "অমৃতবাজার" পত্রিকার ভক্ত ছিল।

কলেজের খেলাধূলার চর্চা মোটামুটি ছিল। যদিও ছাত্রদের খেলাধূলার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ভাল মাঠ ছিল না। কিন্তু হেতমপুর রাজ পরিবারের উৎসাহে ও উদ্যোগে তদানীন্তন বহু খ্যাতনামা ফুটবল টিম হেতমপুর মাঠে প্রদর্শনী ফুটবল খেলে গেছেন। এমনকি এখানে "ইণ্ডিয়ংটন কবিন্থিয়ানস" বনাম "বেঙ্গল বেস্ট ইলেভেন" দলের ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে এখানে এ বি টি এ-এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হেতমপুরে সরস্বতী পুজোয় খুব ধুমধাম হোত। মেলা বসত, কলকাতার থিয়েটার, বীরভূমের কবিগান, লেটোগান হোত। কলেজ প্রাঙ্গণে কৃষি শিল্পের প্রদর্শনী হোত। কলেজের ছাত্ররাও এই উৎসবের শরিক হওয়ার সুযোগ পেত।

ছাত্রদের থাকার জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল। কলেজের নিজস্ব গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থিত এই ছাত্রাবাসগুলি ছাত্রদের

পড়াশুনার অনুকূল ছিল। গৌরাঙ্গ মন্দিরের কিছু দূরে শাল মহুয়ার জঙ্গলের মধ্যে ছিল "মানসারের ছাত্রাবাস"। গিরিডাঙ্গায় (বর্তমান নিবাময় টি বি স্যানাটোরিয়ম) ছিল "গিরিডাঙ্গা কলেজ বোর্ডিং"। সেদিনের "মানসায়ের" ছাত্রাবাস আজও রয়েছে। একজন আবাসিক চিকিৎসক ও কয়েকজন বয়স্ক অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে এই ছাত্রাবাসগুলি পরিচালিত হোত। খাওয়া-দাওয়া, টিফিন, আলো খরচ সমেত মোট চার্জ ছিল মাসিক বারো টাকা। আবাসিকদের মাসে আট আনা করে চিকিৎসা ফি দিতে হোত। ছাত্রাবাসের ভর্তি ফি ছিল দু'টাকা। কোনো সীট ভাড়া লাগত না। বাংলাদেশে আর কোথাও এত সস্তায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছিল না।[১৫]

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম এ, বি এল (১৮৯৭-৯৯)। পরবর্তী অধ্যক্ষরা হলেন শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন, এম এ, বি এল (১৮৯০); শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম এ (ভারপ্রাপ্ত) (১৯০২); অক্ষয় কুমার সেন, এম. এ, বি এল (১৯০৩); রাধিকামোহন চৌধুরী, এম এ (১৯০৫); অতুলচন্দ্র সেন এম এ, বি এল (ভারপ্রাপ্ত) (১৯০৮); অতুলচন্দ্র সেন, এম এ, বি এল (১৯০৯); ধর্মদাস দত্ত (১৯১০); দুর্গাচন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম এ বি এল (১৯২৫-১৯৫৬)।[১৬] শেষোক্ত অধ্যক্ষ এই কলেজে সর্বাধিককাল এই পদে ছিলেন। পরবর্তী অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী গোপালগোবিন্দ মজুমদার। শ্রী সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় রেজিষ্ট্রার ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

এক সময় অধ্যক্ষ ধর্মদাস দত্তকে নিয়ে বাংলাদেশে খুব হৈ-চৈ পড়েছিল। ধর্মদাস দত্ত বি এ ও এম এ পাশ করেন নি। অপর এক ধর্মদাস দত্তের ডিপ্লোমার ডুপ্লিকেট কপি যোগাড় করে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রতারণা করেন। আসল ধর্মদাস দত্ত হলেন শ্রীহট্টের খ্যাতনামা উকিল এবং তিনি রিপন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরবি ঘোষ মহাশয়ের সহপাঠী। এই ঘটনার পর ধর্মদাস দত্ত রেঙ্গুনে চলে যান। শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটি বেশী দূর অগ্রসর হয়নি। শোনা যায়, ধর্মদাস দত্ত জাল প্রমাণিত হলেও কলেজে ইংরাজী পড়াতেন এবং লর্ড লিটন ও লর্ড ফিশারকে যথাযথ মর্যাদায় সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

এই কলেজে বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ অধ্যাপনা করেছেন। এঁদের মধ্যে অধ্যক্ষ রাধিকামোন চৌধুরী, অধ্যক্ষ অতুলচন্দ্র সেন, অধ্যাপক অনিলবরণ রায়, অধ্যাপক কিরণমোহন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিবশরণ চৌধুরী, অধ্যাপক শরৎ সেন, অধ্যাপক লাবনালাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বরেন্দ্রনাথ সোম, অধ্যাপক নিলবরণ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক দুর্গামোহন শাস্ত্রী, অধ্যাপক ত্রৈলোক্যব্রহ্ম চক্রবর্তী, অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন প্রচণ্ড, অধ্যাপক ক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী এবং ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলেজের আয়োজন অপ্রতুল থাকলেও তাঁদের শিক্ষাদান পদ্ধতি ছাত্রদের যথেষ্ট উপকৃত করেছিল। এখনকার মত ঐ সময় পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের ব্যবস্থা ছিল না। এক একজন অধ্যাপক একাধিক বিষয় পড়াতেন। অধ্যক্ষ রাধিকামোহন চৌধুরী গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র পড়াতেন, যদিও তাঁর বিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা। একজন অধ্যাপক কলা বিভাগে ইতিহাস, ইংরাজী এবং তর্কশাস্ত্র পড়াতেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গুরুদাস সরকার, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।[১৭] অধ্যাপক অনিলবরণ রায় ছিলেন দর্শন ও ইংরাজী সাহিত্যের এম এ। বক্তৃতায় তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। একবার সিউড়ীর এক জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসার কথা ছিল, তিনি আসতে পারেন নি। তাঁর জায়গায় অনিলবাবুর বক্তৃতা শুনে সবাই সন্তুষ্ট চিত্তেই ফিরে যান।[১৮] অনিলবাবু পরবর্তীকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত পণ্ডিচেরী "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে" জীবন অতিবাহিত করেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আরো কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং পরে বিহারের কলেজ সমূহের পরিদর্শক নিযুক্ত হন। অপর এক ইতিহাসের অধ্যাপক লাবনালাল মুখোপাধ্যায় ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক রচয়িতা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমদিকে কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রাখা হোত না। এই সময়ে কলেজের রেক্টর ও পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ইতিহাস পড়াতেন। ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনে তিনি ইংরাজী, গণিত এমনকি সংস্কৃতও পড়াতেন। হেতমপুরে আসার আগে তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শোনা যায় তাঁর হেতমপুরের বাসায় একদিন সাপ বের হ'লে, সাপ মারার জন্য কিছু না পেয়ে তিনি একখানি মোটা বাঁধানো বই বের করে দিয়েছিলেন।[১৯] অন্য এক বিশিষ্ট অধ্যাপক জ্যোতিকুমার সেনগুপ্ত বর্তমানে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তিনি নোবেল কমিটির সদস্য। অন্য একজন উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে আসীন ছিলেন।

পাড়া গাঁয়ের কলেজ, আয় ছিল সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। কয়েক জায়গার জমিদারী খাজনা থেকেই কলেজের খরচ মেটানো হ'ত। ফসল কাটার পর দু'বার খাজনা আদায় হোত। কাজেই বছরে দু'বার খাজনা উসুল হোত। এই সময় অধ্যাপকদের বেতনের টাকা শোধ করা হোত। বাকী দশ মাস দশ-বিশ টাকার বেশী তাঁরা পেতেন না। কোনো দিন কোনো ছাত্র বেতন জমা দিলে বা ভর্তি হ'লে, সেই টাকা যাঁর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁকে দেওয়া হোত।[২০] সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর রাজবাড়ীতে বেতনের টাকা গুণে দেওয়া হোত। একটা মোটা চাদরে চার-পাঁচ মাসের বেতন নগদ রূপোর টাকা অধ্যাপকগণ বেঁধে আনতেন। কারণ পল্লী অঞ্চলে তখনও নোটের প্রচলন বেশী হয় নি।[২১] একজন অধ্যাপক তাঁর স্মৃতিচারণায় একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হাতে নগদ টাকা না থাকায় কলেজ লাইব্রেরীতে বই কেনার জন্য তিনি রাজবাড়ীতে ধর্ণা দিয়েছিলেন। তার উত্তরে কলেজের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় একজন বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন "পুরো

একশত টাকা মাইনে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস এম এ-কে বহাল করলাম, আর সে কিনা বই পড়ে তবে ছেলেদের পড়াতে চায়!"[২২]

গ্রাম বাংলার এই মহাবিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র পরবর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদ অলঙ্কৃত করেন। বর্তমানে তিনি তিরুপতি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য। ডঃ কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ছিলেন। এ ছাড়া শ্রী অমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (বিচারপতি, কলকাতা হাইকোর্ট, শ্রী ভক্তিভূষণ মণ্ডল (মন্ত্রী, রাজ্য সরকার), শ্রী ধীরেন সেন (রাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্য সরকার) কলিম সেরাফী (প্রখ্যাত রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী, বাংলাদেশ) শ্রী স্বরূপ গুপ্ত (চীফ অপারেশন ম্যানেজার), পূর্ব রেল, শ্রী সুস্মিতা বিশ্বাস (বিধায়ক) বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সারা বাংলা তথা ভারত জুড়ে অগণিত ছাত্র ছড়িয়ে রয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলেজের প্রবীণতম ছাত্র ছিলেন হেতমপুর গ্রামের নীলরতন সেন। ১৮৯৮ সালে কলেজে প্রবেশ করে তিনি ১৯০৩ সালে এফ এ পাশ করেন।[২৩]

প্রথম থেকে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ মোটামুটি স্বাবলম্বী ছিল। অবশ্য আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে কলেজকে অনেক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়েছিল। "ব্রজবালা ট্রাস্ট" স্থাপনের সময় কলেজকে দেয় বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ছ' হাজার টাকা এবং কলেজ মেরামতি বাবদ একশ টাকা। ১৯২৩ সালে যখন বি এ ক্লাস খোলা হয়, তখন ট্রাস্টের বার্ষিক বরাদ্দ করা হয় ন' হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা। পরবর্তীকালে কলেজকে দেয় ট্রাস্টের অনুদানের চিত্র ছিল নিম্নরূপ :[২৪]

ব্রজবালা ট্রাষ্ট কর্তৃক দেয় টাকা—

১৯৩৩-৩৪	৯৭৮৫	টাকা
১৯৩৪-৩৫	৯২৬৯	,,
১৯৩৫-৩৬	৮০৭৯	,,
১৯৩৬-৩৭	৮৭৭৮	,,
১৯৩৭-৩৮	৮৭৬০	,,
১৯৩৮-৩৯	৬৭৩৫	,,
১৯৩৯-৪০	৭১৭৯	,,
১৯৪০-৪১	৬০৬৪	,,
১৯৪১-৪২	৬৯০৯	,,
১৯৪২-৪৩	৭১৩১	,,
১৯৪৩-৪৪	১০৩০০	,,
১৯৪৪-৪৫	১১০০০	,,
পাওয়া গিয়েছিল মোট -	৯৯৯৮৪	টাকা।
১৯৪৫-৪৬	১৫৪৯২	,,
১৯৪৬-৪৭	১২৫০০	,,
১৯৪৭-৪৮	১২০০০	
মোট পাওয়া গিয়েছিল -	৩৯৯৯২	টাকা

কিন্তু কলেজের আর্থিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটে। ছাত্র সংখ্যা কমে যায়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৬, ১৯৯, ১৪৯ ও ৮৮।[২৫] চারদিকে নতুন কলেজ স্থাপন এর অন্যতম কারণ। এছাড়া কলেজের ট্রাষ্ট সম্পত্তির অধিকাংশই বিহার সরকারের জমিদারী। প্রথা বিলোপ সাধনের আওতায় পড়ে যাওয়ায় কলেজের প্রাপ্য বার্ষিক ভাতা পাওয়া যায় না। ১৯৫১ সালে ছাত্রসংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ৬৩। ডি পি আই প্রদত্ত গ্রান্ট-ইন-এইড এই কলেজ আগে পেতনা। ১৯৪৮ সাল থেকে মাসিক পাঁচশ টাকা অনুদান বরাদ্দ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আর্থিক সঙ্কট মেটানো সম্ভব হয় না। পুরাতন অধ্যাপকদের অনেকেই কলেজ ছেড়ে চলে যান। ১৯৫৪ সালের পর থেকেই ছাত্রসংখ্যা কিছু (১৭৩) বাড়লেও সমস্যার সুরাহা হয় না। এই সঙ্কটময় অবস্থায় "ব্রজবালা ট্রাষ্ট" এর ট্রাষ্টীগণ অর্থসংকট মেটাতে দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭২ বিঘা ধানের জমি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিহার সরকার থেকে প্রাপ্ত অ্যানুইটির দুই-তৃতীয়াংশ (আনুমানিক ত্রিশ হাজার টাকা) কলেজের জন্য দিতে তাঁরা স্বীকৃত হন। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "স্পনসর্ড স্কীম" অনুসারে ১৯৫৬ সালের ১লা জুলাই থেকে "কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ" "গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কলেজে" পরিণত হয়। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গণিত, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বাংলা, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্মানিক পাঠক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি বি.কম (পাশ), সেরিকালচার (পাশ) ও অর্থনীতি, জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় সাম্মানিক পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে। নতুন গৃহনির্মানের জন্য সরকারী অর্থ অনুদানে পাওয়া গেছে। বীরভূম জেলার অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর কলেজগুলির মধ্যে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৯৬ সালে এই মহাবিদ্যালয় শতবর্ষের পথ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করেছে।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে জেলা শহর নয়, মহকুমা শহর নয়, অনগ্রসর বীরভূম জেলার এক নামহীন পল্লীগ্রামে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শহরের ধূলিমলিন আবহাওয়া ও কোলাহল থেকে দূরে শান্ত পরিবেশে পড়াশুনার সুযোগ ছিল এখানে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোনো কৃত্রিম ব্যবধান ছিল না। মাটির ঘরে বাস করা অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে আসতে ছাত্রদের কোনো সংকোচ ছিল না। অবশ্য গ্রামের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায় বিয়ে, পৈতে, বারো মাসের তেরো পার্বনের কোলাহল কলেজের পঠন-পাঠনের বিঘ্ন সৃষ্টি করত। (আজও সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে নি)। বর্তমান কলেজকে অধুনা মানসায়ের ছাত্রাবাসের কাছে প্রাকৃতিক পরিবেশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রস্তাব একবার এসেছিল। কিন্তু তা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

অবিভক্ত বাংলার তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রসার আন্দোলনের ইতিহাসে হেতমপুর কলেজের ভূমিকা ঐতিহাসিক। ঊনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের শেষ মুহূর্তে এই কলেজের জন্ম। জেলার

উচ্চশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে এই মহাবিদ্যালয়ের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত স্বল্প ব্যয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে এই কলেজ। আমাদের মতো অনগ্রসর দেশে এর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো। শুধু বীরভূম জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই হেতমপুর কলেজের শিক্ষার প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সময় সমগ্র সাঁওতাল পরগণা, মালদহ জেলা, মানভূম জেলা, আসানসোল-কালনা-কাটোয়া মহকুমায় কোনো কলেজ না থাকায় বহু ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে পড়তে আসত। শহরের কলুষমুক্ত কলেজীয় শিক্ষাদানের একমাত্র কেন্দ্র ছিল হেতমপুর। হেতমপুর কলেজ সম্পর্কে এই কলেজের প্রথম ছাত্র ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের (যিনি ১৯০৬ সালে এক এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন) মন্তব্য করেছেন—

"Hetampur enjoyed the unique distinction of being the site of the only college in the district and its contribution to the cause of higher education in rather backward area is worthy of being chronicled in the history of Birbhum."[২৬]

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে দেশের সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রসারিত করা এবং তা সাধারণ গরীব মানুষের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে আসা এই দুই বিষয় হোল আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। উচ্চশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রায় একশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজকে এই সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

: নির্দেশিকা :

১। History of Education in India. (1951) Syed Nurullah and J. R. Naik. PP. 200.
২। ঐ
৩। কলেজের নথিপত্র
৪। ঐ
৫। ঐ
৬। বীরভূম বিবরণ (১ম খণ্ড) সম্পাদনা শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী পৃষ্ঠা-৬৯
৭। ঐ পৃষ্ঠা ৫৬
৮। ঐ পৃষ্ঠা ৪
৯। Calcutta University Calender, 1930 PP. 543
১০। ঐ 1930, 36, 40
১১। ঐ 1948 PP 158
১২। ঐ 1930. 36, 40
১৩। (ক) ঐ
১৪। (খ) My Remimiscoences of Hetampur, Prof. L. Mukherjee পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা-16
১৫। কলেজ স্মৃতি, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ পত্রিকা হীরক জয়ন্তী সংখ্যা (১৯৫৮) পৃষ্ঠা ৬২
১৬। C.U. Calender 1940 PP.618
১৭। কলেজের নথিপত্র
১৮। Reminiscences of Hetampur of Srikumar Banerjee, Hetampur পত্রিকা PP 2
১৯। আমাদের কলেজ, নীরদেন্দু সান্যাল, পূর্বোক্ত পত্রিকা, পৃষ্ঠা ৭৮
২০। ঐ পৃষ্ঠা ৭৭
২১। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার পূর্বোক্ত পত্রিকা—পৃষ্ঠা ৮
২২। ঐ পৃষ্ঠা ৯
২৩। ঐ পৃষ্ঠা ৯
২৪। কলেজে হীরক জয়ন্তী উৎসবে অধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত ভাষণ পূর্বোক্ত পত্রিকা পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট ৫
২৫। কলেজের নথিপত্র
২৬। ঐ
২৭। Reminiscences of Hetampur PP 7

[সুদূর মাটি' শারদ সংকলন, ১৯৯৪ থেকে পূর্ণমুদ্রিত]

(৩১)

॥ হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে চারণকবি সম্মেলন ॥

(১৯৬৪)

ডঃ কিশোরীরঞ্জন দাশ (প্রাক্তন রীডার ও প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার অধুনা মাড়গ্রাম থানার পোপাড়া সাহাপুর গ্রামে ১৯৩৬ সালের ১৮ ই জুলাই আমার জন্ম। আমার গ্রামের ৩ মাইল দক্ষিণে ডাবুকেশ্বর শিব ও প্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরচন্দ্রপুর গর্ভবাস এবং খাড়া দেড় মাইল পশ্চিমে বিখ্যাত সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধন-লীলাক্ষেত্র ও এযুগের উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র - বশিষ্টারাধিতা তারাপীঠ। এই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির যুগেও পোপাড়া সাহাপুরের শিবের গাজনে সন্ধ্যার দীপে তেল না থাকলেও জলেও আলো জ্বলে। এই গাঁয়ে বাল্যকাল থেকে শিবমন্দিরের প্রাঙ্গনে শুনে এসেছি কীর্ত্তন-টপকীর্ত্তন, যাত্রা এবং পাশের বীণাপানি ক্লাব প্রাঙ্গণে শুনেছি কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা, আলকাপ এবং মুচিপাড়ার আগে ফাঁকা বাথানে শুনেছি ঝুমুর। এসব এখন গ্রামে আর তেমন দেখা যায় না, শুধু ক্লাবের ছেলেরা যাত্রা থিয়েটারের অভিনয় ও প্রতিযোগিতা করে আসর মাতায়। গ্রামে তিন পুরুষের কবিয়াল বংশ - জানকী মহারাজ থেকে শ্রী সুকুমার রায় আজও কবিগান করে চলেছেন। লম্বোদর চক্রবর্ত্তীর গুরু ছিলেন জানকী মহারাজ।

যাক এই বালক আমি স্কুলের গন্ডী ছাড়িয়ে বড় স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ছেলে মেয়ে পড়ানোর কাজে অর্থাৎ স্কুল শিক্ষকতার কাজে প্রথমে দু-আড়াই বছর কাটিয়ে এই জেলারই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের পুরাতনতম হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে এসে ঠেকে গেলাম স্রোতের শেওলার মতো ভাসতে ভাসতে। সালটা ১৯৬২, সেপ্টেম্বর ৬ই। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩১ শে জুলাই ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত নানা কান্ডকারখানার পর কর্মজীবনের অবসান ঘটিয়ে অবসর নিলাম সূর্যাস্তকালে। ১৯৬২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর - কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী গোপালগোবিন্দ মজুমদার; তাঁর আগে কলেজ ছেড়ে গেছেন অধ্যক্ষ শ্রী সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী গিরিধারী শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ্বর সান্যাল, প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, আমার বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিক, হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস,রাশীদুল হাঁসান, মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সমীর মুখোপাধ্যায়, দীপ্তিসাধন বসু, সুধাংশু কুমার চন্দ্র, প্রদ্যোৎ কুমার চন্দ্র, কৌশাম্বীনাথ মল্লিক (কবি কুমুদরঞ্জন-এর পুত্র), সাজ্জাদ আলি, নিরঞ্জন সেন। এদের সবার প্রীতিপূর্ণ সাহচর্য ও সান্নিধ্য আমার মানসিক - সাংস্কৃতিক - বৌদ্ধিক চেতনাকে ক্রম প্রসারিত করে তোলে। সেই সঙ্গে অফিসের শিক্ষাকর্মীদের - বড়বাবু নিত্যানন্দ দত্ত, ক্যাসিয়ার কিরীটিভূষণ পাল এবং অন্যতম করণিক সংকর্ষণ দত্ত, সহকারী লাইব্রেরীয়ান অজিত পাল প্রমুখের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করে। তাঁদের ঘর থাকলেও তাঁরা বেশিক্ষণ কলেজেই পড়ে থাকতেন, তাঁরা ছিলেন একান্ত ঘরোয়া। মানিক চক্রবর্ত্তী, তেলারাম হাজরা, ধরম দেও পুরানোদের মধ্যে কলেজে এখনোও কাজ করছেন, কিন্তু শিবু সূত্রধর, কার্ত্তিক মুখোপাধ্যায়, সন্ন্যাসীচরন দে, দুঃখহরণ হাজরা প্রমুখ অনেকেই দেহ রেখেছেন, অনেকেই অবসর গ্রহণ করেছেন। পূর্বোক্তদের উত্তরপুরুষ চঞ্চল, ফাল্গুণী (বড়বাবু), মোহন, পরমানন্দ, শ্রীকান্ত, বিশ্বনাথ, শরৎ প্রমুখ এখন কলেজে নিযুক্ত হয়েছেন। জয়দেব, সমর, ধর্মদাস, পরিমল, সিন্ধুময় প্রমুখ নতুন নিযুক্ত হয়েছেন। মহম্মদ ঈশা, সুনীল দত্তমুদী, পবিত্র সরকার, কল্যাণ, জ্ঞান, ষষ্ঠিধর মন্ডল, নীরদবরণ পাল প্রমুখ আমাদের ছাত্র ছিলেন - এঁরা কলেজের বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আমার যোগদানের ২/৩ মাস পরে এসেছিলেন অধ্যাপক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় (এখন অবসরপ্রাপ্ত); আরো পরে পরে এসেছিলেন দয়াময় রায় (অবসরপ্রাপ্ত), হাফিজ সাহেব, বসন্তবাবু, স্বাধীন গুপ্ত (বর্ত্তমান অধ্যক্ষ), শ্যামাপ্রসাদবাবু, (বারসার), গুণধর বাবু, রঞ্জিৎবাবুরা। এখন পুরাতনদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক প্রদ্যোৎকুমার চন্দ্র (অবসর আসন্ন)। বাংলা বিভাগের বর্ত্তমান প্রধান অধ্যাপক ডঃ মহম্মদ আলাউদ্দিন, ডঃ সুচিত্রা সেন (স্থানান্তরিত), দেবাশিস দাস, অসীম চট্টোরাজ এবং আমার শূন্যপদে ডঃ আশিস চক্রবর্ত্তী কার্যরত। আমার থাকাকালীন অন্যান্য বিভাগে বহু অধ্যাপক এসেছেন, অনেকের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাধানাথ আচার্য, তরুন দাস, স্বপন দে, প্রণব চট্টপাধ্যায়, ষষ্ঠি গোপাল সাহা, অনির্বাণ বিশ্বাস, লক্ষ্মীনারায়ন দত্ত, অমিয়ভূষণ বিশ্বাস, স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চৌধুরী, অশোক

বিদ্যুৎবাবু, আমিনুল বাবু, সুকান্ত বাবু, প্রনবানন্দ মন্ডল প্রমুখের নাম করা যায়। আংশিক অধ্যাপক অরূপ দত্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জীর নাম মনে আসে। আরো অনেকেই এসে অন্যত্র চলে গেছেন বৃহত্তর ক্ষেত্রে, যেমন জগবন্ধু মেন্দা, নিতাই প্রামানিক।

প্রতি বৎসর কত ছাত্র-ছাত্রী এসেছে-গিয়েছে তার হিসাব মনে রাখা সম্ভব নয়, তবে অনেকের নাম আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে আমাদের যেসব ছাত্র-ছাত্রী যাত্রা-থিয়েটার-সাহিত্য কর্মে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাদের অনেকের নাম হৃদয়ে আপনা আপনি গাঁথা হয়ে গেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে অনেক ছাত্রছাত্রী-শিক্ষাকর্মী- অধ্যাপক কাজ করেছেন; আমিও প্রথম প্রথম কলেজে গিয়ে অগ্রজ অধ্যাপকদের স্নেহ পরামর্শে উপযুক্ত রূপে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছি। কলেজে ১৯৬২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত (মাঝে দু-এক বছর বাদে) বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলিতে, সাহিত্যসভায়, বিশ্বকর্মা ও সরস্বতী পূজায় বিচিত্রানুষ্ঠান, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, কীর্তনগান হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীগোপালগোবিন্দ মজুমদারের প্রেরণায় অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু গুপ্ত, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ মল্লিকের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপকরা অনুষ্ঠানে মেতে উঠতেন। আমরাও তাতে তেতে উঠতাম। শেষের দিকে আমার উপর এসব পরিচালনার দায়দায়িত্ব এসে পড়ে। আমারও ভালো লাগতো সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সংযোগসাধনে। শুধু ক্লাসরুমের পঠন-পাঠনের চাকুরিতে তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না, - বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাও যায় না, যদি না খেলাধূলা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মনে আনন্দঘন সৃষ্টিধর্মী প্রেরণা সঞ্চার না করা যায়। খেলাধূলায় ছাত্রদলের সঙ্গেও আমি অন্যান্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের সঙ্গে গিয়েছি বাইরে - বর্ধমান - সিউড়ী দুই জায়গায়। শিক্ষামূলক ভ্রমণেও ছাত্রদের সঙ্গী হয়েছি বহুবার।

তাই আমার কর্মক্ষেত্র শুধু কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো না - বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে, শহরে, নানাক্ষেত্রে ছুটে যেতাম। যথেষ্ট আনন্দ পেতাম। এই প্রসঙ্গে চাকুরীর প্রথমদিকে কলেজে একটা বিশেষ লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানের কথা আমার স্মৃতির ঝুলি থেকে উপহার দিতে চাই। এ ঘটনা থেকেই আমার জীবনের একটা মোড় ঘুরে যায়। ১৯৬৪ সালে সম্ভবত সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কলেজে তথা গ্রামে কবিগানের আয়োজন করতে মনস্থ করেন তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীগোপালগোবিন্দ মজুমদার। উনি আমাকেই দায়িত্ব দিলেন বাংলার সে সময়ের বিখ্যাত দুই চারণকবি গুমানী দেওয়ান-লম্বোদরকে যোগাযোগ করে আনার। আমি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার জিনদীঘি গ্রামের গুমানী দেওয়ান ও বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমার তারাপীঠ সন্নিকট খরুন গ্রামে লম্বোদর চক্রবর্ত্তীকে চিঠি দিলাম। বলা বাহুল্য দুজনের সঙ্গে আমার কয়েকটি আসরে ইতিমধ্যে আলাপ হয়েছে। আমার আমন্ত্রণে দুজনেই আন্তরিক ভাবে সাড়া দিলেন এবং রাজী হলেন। এদিকে হেতমপুরে সরস্বতী পূজার ধুমধামের খ্যাতি সুদূর বিহার থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আগে কলকাতার বড় বড় থিয়েটার দল, যাত্রাপার্টি আসতো মেলায়। গুমানী-লম্বোদরের কবিগান হবে শুনে স্থানীয় সংস্কৃতিপ্রেমিক মানুষের মনে দারুণ সাড়া জাগলো। সেই সুবাদে আমার মতো তরুণ অধ্যাপকের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো - উনি যোগাযোগ করেছেন ইত্যাদি। সেই আসরে গুমানী এলেন তাঁর দলবল নিয়ে, কিন্তু প্রতিপক্ষ লম্বোদর এলেন না কোন কারণে। তাঁর সঙ্গে দোহার হিসাবে তাঁর শিষ্য কামাখ্যার (মাড়গ্রামের পাশে) হরেকৃষ্ণ দাস এসেছিলেন। উনি আমাকে বললেন আসর মাটি করা হবে না, হরেকৃষ্ণ দাস আমার কবিগানের শিষ্য, ওকে খাড়া করেই আমি গাইবো। আমি বললাম, আপনি একাই একশো, আসর রাখুন। সেদিন মহাভারতের দুর্যোধন-কৃষ্ণ পালা হয়েছিল (যতটা মনে পড়ে)। হরেকৃষ্ণ দাসকে সামনে রেখে গুমানী একাই আসর মাৎ করে দিলেন। তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রকথায়, হাস্যরসের চুটকীর ঝঙ্কারে, উপস্থিত বুদ্ধির খেলা ও টক্কার চটকে - অনুপ্রাসের লহরায়। সেই দিনই তিনি আমাকে বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ চারণকবি সম্মেলনের (৭ ম বার্ষিকী) আয়োজন করুন হেতমপুর কলেজে। আমি অধ্যক্ষ মশায়ের কাছে উনার এই প্রস্তাবের কথা তুলে ধরি। অধ্যক্ষ মশাই সাদরে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং বলেন কিশোরী দায়িত্ব নিলেই হবে।

আমি সেদিন আমার অগ্রজ অধ্যাপক সহকর্মীদের মুখের পানে চেয়েছিলাম অনুমতি চেয়ে। সবাই বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ, দায়িত্ব নেন, আমরা আপনার পাশে সহযোগিতা করবো। প্রমোদ দা এবং মাষ্টার মশাই কৃষ্ণনাথ বললেন কিশোরী সম্পাদক, আমরা ওর সঙ্গে থাকব। আমি চুপ করে আছি। গুমানী সাহেব বললেন, ভাই আপনি না বললে আমার কাজটি উদ্ধার হয়। অগত্যা অনুরোধে ঢেঁকি গিললাম। ৭ ম বার্ষিকী পশ্চিমবঙ্গ চারনকবি সম্মেলনের আয়োজন শুরু হলো। গুমানী সাহেব সশরীরে বা পত্রযোগে যথাবিহিত নির্দেশ পাঠান।

কলেজের মাননীয় অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ ও স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, বিশিষ্ট

নাগরিক ও অফিসারদের নিয়ে অধ্যক্ষ মশাই কলেজে একটা মিটিং ডেকে (১০ই এপ্রিল ১৯৬৪) এই সম্মে
একটা অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির ঃ-

সভাপতি - শ্রীযুক্ত গোপালগোবিন্দ মজুমদার

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ - মহারাজকুমারী জ্যোৎস্নাময়ী দেবী ও
কুমার রেবতীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক - শ্রী কিশোরীরঞ্জন দাশ

সদস্যবৃন্দ - শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর সান্যাল
" প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
" কৃষ্ণনাথ মল্লিক এবং
অন্যান্য অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
" বাসুদেব মজুমদার
" দেবীপ্রসাদ রায়
ডাঃ শিবদাস মুখোপাধ্যায়
নিরাময় ও মানসায়ের হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারবৃন্দ
প্রধান শিক্ষক - হেতমপুর রাজ হাইস্কুল ও
দুবরাজপুর সারদা বিদ্যাপীঠ
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চন্দ্র।

সভায় স্থির হয় - ১) ৭ ম বার্ষিকী পশ্চিমবঙ্গ চারনকবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল (
চৈত্র ও ১লা বৈশাখ ১৩৭১) ১৯৬৪।

২) হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের পূর্ণ সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ পত্রের খসড়া রচিত হয়
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রী গোপালগোবিন্দ মজুমদার এবং সম্পাদক শ্রী কিশোরীরঞ্জন দা
আমন্ত্রণ পত্র লেখা হয়। অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ করে নিমন্ত্রণ পত্র সঙ্গে আনার অনুরোধ জানানো হয়।

৩) অনুষ্ঠানসূচী - ১৩ ই এপ্রিল, ৬৪ - বিকাল ৪ টায় চারণকবি সম্মেলনের শুভ সূচনা। সন্ধ্যা
সারারাত্রি কবিগান।

১৪ই এপ্রিল - সকাল ৭ টায় রচনা প্রতিযোগিতা,
বিকাল ৪ টা থেকে সারারাত্রি কবিগান।

স্থান - সম্মেলন - কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ হল
কবিগান - হেতমপুর রাইস মিল প্রাঙ্গন।

৪) দুবরাজপুর-হেতমপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করা হোক।

৫) প্রধান অতিথি - শ্রী হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন।
সভাপতি - শ্রী অমিয়কুমার মিত্র, জেলা সমাহর্ত্তা।

৬) কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় - ক) বিদ্যুৎ সংযোগ - শ্রী নারায়ণ কর্মকার, খ) প্যান্ডেল, কাউন্টার
ব্যবস্থাপনায় - শ্রী উমাকান্ত চট্টরাজ।

৭) খাওয়ার ব্যবস্থা -
ক) সকালে টিফিন - মুড়ি, তেলেভাজা, মিষ্টি (একখানা) ও চা
" - শুধু চা
খ) দুপুরে - ভাত (দুদিন) - হোষ্টেলে
রাতে - লুচি ও বোঁদে - দোকান থেকে
তরকারী - হোষ্টেল থেকে।

আমি এই প্রস্তাব ও ব্যবস্থাপনার কথা জিনদীঘিতে ওমানি সাহেবকে জানিয়ে দিই। উনি খুশি হ

...বাদ পত্র জানান এবং একটি পত্র ছাপিয়ে চারণকবিদলকে জানিয়ে দেন যথাসময়ে হেতমপুর কলেজে সম্মেলনে ...সের জন্য। তার মুদ্রিত পত্রটি ছিল নিম্নরূপ -

প্রভু

মহান,

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিজড়িত বাংলার নিজস্বসম্পদ কবিগানটিকে চির রক্ষার্থে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের ...সহানুভূতিতে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় চারণ কবিগণের একটি সম্মেলন হইবে।

সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গহেতু আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি। ত্রুটি মার্জনা করিবেন। নিবেদক -

গুমানী দেওয়ান

সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ চারণকবি সমিতি

স্থান - বীরভূম জেলার হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ প্রাঙ্গন।

১৩ই এপ্রিল (১৯৬৪) বেলা ৪ ঘটিকায় সভা আরম্ভ, রাত্রে গান।

১৪ই এপ্রিল (১৯৬৪) প্রাতঃ ৭ টায় প্রকাশ্য অধিবেশন, বৈকাল ৪ টা হইতে সমস্ত রাত্রি গান।

পৃথক একটি প্রচার পত্রে তিনি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন যে, ৪২ টি কবিগান দলের সমাবেশ, পরস্পরের মধ্যে ...যোগিতা হবে। দুদিন ২২ নঃপঃ করে টিকিট কেটে কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য এই সম্মেলনে প্রায় ...৫ টি কবিগানের দল আসে। লম্বোদর চক্রবর্ত্তী এই সম্মেলনে এসে গান করেন এবং সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে না ...তে পারার হতাশা দূর করেন। দেবেন দাস, কিশোরী কোঁড়া, কিশোরীমোহন রায় প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা কবিওয়ালার ...বেশ ঘটে।

এদিকে জেলা সমাহর্ত্তা শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার মিত্রকে সম্পাদক হিসেবে নিজে এসে তাঁর বাংলোয় দেখা করে ...ত্র দিয়ে যথাসময়ে যোগদানের অনুরোধ জানাই। তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করার জন্য সম্মতিদান করেন। ...অতিথি শ্রী হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নকে লোক মারফৎ চিঠি পাঠাই। তিনিও সম্মতি জানিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে ...আমরা সকলেই উৎসাহিত বোধ করি। এই অনুষ্ঠানে সিউড়ী থেকে 'একতারা' পত্রিকা সম্পাদক দেবী সিংহ প্রমুখ ...কেই আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। শ্রী নেপাল মজুমদার তখন গ্রামেই অর্থাৎ হেতমপুরেই থাকতেন, তিনিও সভায় উপস্থিত ...সিউড়ী তথা জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ...পুর-দুবরাজপুরের বিশিষ্ট নাগরিক বৃন্দ দুদিন ধরে সভার শোভা বৃদ্ধি করেন।

বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান কবিগান আজও দর্শকমনে গভীর সাড়া জাগায়। স্বাধীনতা আন্দোলনে, ...তঃ ১৯৪৬-৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা রোধে এই কবিগান গেয়ে রমেশ শীল (পূর্ববঙ্গের), গুমানী-...দেবেন কবিয়ালরা পরম সহযোগিতা করেন। পশ্চিমবঙ্গে গুমানী-লম্বোদরের কবিগানের কথা শুনে দশ-বারো ...ক্রোশ দূরের দর্শকরা সারি বেঁধে হেঁটে, গরুর গাড়ি করে আসরে এসে হাজির হোত। তাঁদের গানের তীব্র আকর্ষণ ছিলো। ...কবিগান উচ্চাঙ্গের ও উপভোগ্য ছিল। বর্ত্তমানে এমন গায়কদলের একান্ত অভাব দেখা যায়।

আমি এই কবিগানের সংগ্রহে উৎসাহিত বোধ করি। পরে জয়দেবের মেলায় মেলায় বাউল গানও সংগ্রহ করি। ...একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন মন্ডল (বিশ্বভারতী) মহাশয় একবার জয়দেবের মেলায় ...হওয়ার পর গবেষনা কার্যে নিযুক্ত হতে পরামর্শ দেন। আমি দুটি বিষয়ের কথা বলি - ১) বাউল গান ও ২) ...শ্রদ্ধেয় ডঃ মন্ডল আমাকে বাউল গান বাদ দিয়ে কবিগান নিয়ে গবেষণার নির্দেশ দেন। আমি পশ্চিমবঙ্গের ১২ ...জেলায় বিগত তিনশো বছরের কবিওয়ালা ও কবিগানের ক্ষেত্রসমীক্ষা করি ১০ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী ...কমিশনের আর্থিক অনুদানে। এ বিষয়ে আমার অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য ...করেন। ডি. ফিল. সির প্রজেক্ট সম্পূর্ণ করে তার অংশ বিশেষ পৃথক ভাবে থিসিস হিসাবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা ...দিয়ে ১৯৮৬ সালে পি. এইচ. ডি উপাধি লাভ করি। আমার মাষ্টার মশাইরা, অধ্যক্ষ মশাই, সহকর্মীরা আনন্দ প্রকাশ ...করেন। এর মূলে রয়েছে ঐ ১৯৬৪ সালের কলেজে পশ্চিমবঙ্গ চারণকবি সম্মেলন সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ ও আমার ...গ্রামে কবিয়াল জানকী মহারাজের ও তাঁর পুত্র কিশোরীমোহন রায়ের কবিগানের প্রভাব। আজও কবিগানের ...আমাকে টানে।

□

37

ঊনিশ শতক—বীরভূমের শিক্ষাধারা

ড. রঞ্জন গুপ্ত

১. বৃহত্তর পশ্চাদপট সম্পর্কে কিছু কথা :

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়েছিল প্রচলিত এই লোকবিশ্বাসের পেছনে আধুনিক গবেষণা-লব্ধ ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সমর্থন নেই। বস্তুত, কবি-কথিত "বণিকের মানদন্ড" শর্বরী পোহালেই "রাজদন্ড রূপে" দেখা দিয়েছিল এমন কথা রূপক হিসাবে মনোরম হলেও প্রকৃত বাস্তবতাকে সূচিত করেনা। তবে একথা ঠিক, বাংলা তথা ভারতের তদানীন্তন সর্বাত্মক নৈরাজ্য সামাজিক- সামরিক-আর্থনীতিক ভাঙন এবং সর্বোপরি দেশীয় রাজণ্যবর্গের অনপনেয় পারস্পরিক শত্রুতা-বিদ্বেষ, প্রথমে ধীরে, পরে তীব্র গতিতে ইংরাজ কোম্পানীকে একটি পুরোপুরি বণিক শক্তি থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছিল। ঊনিশ শতকের প্রথম অর্ধাংশের মধ্যেই ভারতের অধিকাংশ ভূখন্ডে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তখনও তার সামগ্রিক ক্রিয়া-কলাপে বণিক-মানসিকতা ও স্বার্থবোধেরই প্রাধান্য। অর্থাৎ বাণিজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তাই ছিল সাম্রাজ্য প্রসার ও পরিচালনার মূল লক্ষ্য। অচিরেই অবশ্য উভয় লক্ষ্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। লক্ষ্য-পূরণে প্রশাসনের নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের নামে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা তারা করেছিল। সব দিকে পরীক্ষা চালালেও দেশের ধর্ম, সমাজ, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির দিকে তারা হাত বাড়ায়নি। সে সব ছিল তাদের কাছে নিষিদ্ধ অঞ্চল এবং অসংখ্য শ্রুত-অশ্রুত আশঙ্কা আতঙ্কে কন্টকিত হয়ে দুর্লংঘ। "নিদ্রিত কুকুরটা নিদ্রিত থাকুক" এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী ছিল তারা। সে জন্য ১৭৯৩ সালে ইংলণ্ডের ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটীর উইলিয়ম কেরী খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পদার্পণ করলেও কোম্পানী সেখানে তাঁকে আশ্রয় দেয়নি। এক নীলকর সাহেবের আহ্বানে অগত্যা তাঁকে ধর্ম প্রচারের সূত্রপাত করতে হয় মালদহ জেলার এক অজ পাড়া গ্রামে। পরে, ১৭৯৯ সালের শেষে মালদহের গ্রাম ছেড়ে চলে এসে কেরী মিশন স্থাপন করেন, —না, কলকাতায় নয়, বা কলকাতার সংলগ্ন কোম্পানীর কোন স্থানেও নয়—ওলন্দাজ-অধিকৃত শ্রীরামপুর শহরে। শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। জনসাধারণের মধ্যে খৃষ্টধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এক, ইংরাজী শিক্ষাদানের পাশাপাশি বহু বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাঁরা। এবং দুই, বাংলা ভাষায় বাইবেলের অনুবাদসহ রচনা করেন বেশ কিছু শিশুপাঠ্য পুস্তক। বিদ্যালয় ও মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া যে কোন বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতির পক্ষে জনমানসে প্রবেশ করা সম্ভব নয় তা বুঝবার মত দূরদৃষ্টি তাঁদের ছিল। জন্য হলেও এই বিদেশী মিশনারী গোষ্ঠী ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন, বাংলা গ্রন্থরচনা ও মাতৃভাষাকে শি করে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন গৌরবময় ঐতিহ্যের অবিনাশী অঙ্গ।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ করে দিলে ধর্ম-ভীরু স আতঙ্কিত হয়ে ইংরাজদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হ বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের পথে হবে গুরুতর প্রতিবন্ধক এই দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। শিক্ষাবিস্তারে কোম্পানীর অনীহার পেছনে আরো এ কারণ ছিল। শিক্ষা, বিশেষত জনশিক্ষা, অজ্ঞ মানু ঘোচায়, নৈতিক ও মানসিক জড়তা দূর করে— সকল শিক্ষা-বিশেষজ্ঞই একমত। তাই যদি হয়, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের কাছে এ এক মস্ত বিপদের তদুপরি বণিকের বিবেচনায় শিক্ষাখাতে ব্যয় হল এক অপচয়। ব্যবসা-বাণিজ্য যদি হয় মূল লক্ষ্য এবং তা ও সুরক্ষিত করতে যদি প্রয়োজন পড়ে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবিস্তারের মত বিপুল ব্যয়-বহুল ধারাবাহিক কর্ম বিদ্যালয় স্থাপন যে একটি নিকৃষ্টতম, এমনকি বিনিয়োগক্ষেত্র তাতে কোন সন্দেহই থাকে না। লা শিক্ষার কাটা খাল দিয়ে জ্ঞানবুদ্ধিচেতনা, এবং পরিশেষে 'কুমিরের' অনুপ্রবেশও অসম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদী-প্রবর ওয়েলেসলী ১৮০০ সালে প্রতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। কেরী এখানে বাংলার শিক্ষ নিযুক্ত হন। আমাদের একটু আগের মন্তব্যের পরে একটু বেমানান ঠেকে বৈকি! কিন্তু একথা স্মরণে রা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছিল জনশিক্ষা নয়—সাম্রাজ্যশাসনের স্বার্থে। প্রশাসক হিসাবে বি সদ্য আগত অসংস্কৃত "জনবৃষ"দের কিছুটা পালিশ রীতিনীতি সংস্কার ভাষা সম্পর্কে কাজ চালাবার মত ধার প্রয়োজন ছিল। "সাপ-বাঘ-ফকির ও নগ্ন সাধু-সন্ন্যা বিচিত্র বহু ভাষা-ভাষী মানুষের এই অলৌকিক দে মানুষের মুখের ভাষা পুরোপুরি অবোধ্য থাকলে কি দেশীয় দালাল-মুৎসুদ্দী দিয়ে প্রশাসন চালানো সম্ভ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী স্বীকার করেও বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও পুস্তক রচনা শ্রীরামপুর মিশনের মত, এই কলেজের ঐতিহাসিক অ

যে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন এবং আমাদের বিষয়ের পক্ষেও অপ্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় আর একটি ক্ষেত্র ছিল যা কোম্পানী সভয়ে ও এড়িয়ে চলতো। সেটি হলো ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সুপ্রাচীন -লালিত বহু সামাজিক অনাচার ব্যাভিচার কুপ্রথা ও রের পুতিগন্ধময় আঁস্তাকুড়। যে কারণে তারা অধিকৃত খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরোধী ছিল, এখানেও সক্রিয় ছিল সেই বিবেচনা। ধর্মীয় ও সামাজিক স্থিতাবস্থার ভিতে আঘাত দূরে থাকুক, বহিরঙ্গে আঁচড় কাটাকেও তারা তাদের মূল সিদ্ধির পথে ক্ষতিকর বিবেচনা করতো।

কিন্তু উনিশ শতকের প্রারম্ভে খোদ ইংলণ্ড থেকে ক্রমবর্ধমান বিপরীত হাওয়া প্রায় ঝড়ের গতিবেগ নিয়ে আছড়ে পড়লো -লিত সযত্ন-লালিত দীর্ঘ অনুসৃত নীতি ও ধরা-বাঁধা চিন্তার প্রচারে। সময়টা ছিল বড়ই দুরন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শকে শুরু হয়ে শতাব্দীর সমাপ্তির মধ্যেই ইংলণ্ডের এক প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রভাব পড়ে ইংলণ্ডের সর্বস্তরে — সমাজে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে, অনুসন্ধিৎসায় তথা সামগ্রিক চিন্তা-চেতনায়, । ইংলণ্ডের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব সুদূরপ্রসারী বিপ্লব। ইল পুঁজির বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী অভিযানের এ যেন পাহাড় হারকিউলিসের প্রয়াস। এর সাফল্যের মধ্য দিয়ে শতাব্দীর সময়ে জন্ম নেয় শিল্প পুঁজি। আরো চতুর, আরো আরো আক্রমণাত্মক এর ক্রিয়াকলাপ। এটি আবার ফরাসী মহাকাল। নতুন যুগের চিন্তা-চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ঘটে মিল-বেন্থামের উপযোগিতাবাদে; ভারতে ইষ্ট কোম্পানীর একচেটে বাণিজ্যিক অধিকার বিলোপের দাবীতে; আর ক্রীতদাস মুক্তির সাফল্যে উদ্দীপিত র্সের নেতৃত্বে ভারতে খৃষ্টান মিশনারীদের অবাধ প্রচারের প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। মূল লক্ষ্য একটি: "শ্বেতাঙ্গদের "বর্বর" ভারতীদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও -সাংস্কৃতিক অধঃপতন থেকে উদ্ধার করে তাদের সভ্যতার প্রদর্শন করা। এবং এইজন্য চাই পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর মার্কেন্টাইল বণিক-ব্যবসায়ীদের প্রত্যক্ষ জবরদস্ত ১৮২৩ সালের চার্টার এ্যাক্টে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবীটি পেল। ভারতের বাণিজ্য উন্মুক্ত হলো ইংলণ্ডের বণিক ওলার জন্য। খৃষ্টান মিশনারীরা অধিকার পেল অবাধ ইসলাম অবশ্য তাদের অধিকার প্রয়োগের বাইরে ইসলামের কঠোর সাংগঠনিক কাঠামো আর প্রচণ্ড ওয়াহাবী ও ফেরাইজী আন্দোলন তাদের বর্মের অন্যদিকে হাজার জাত পাতে বিভক্ত তাচারে অতিষ্ঠ হিন্দু সমাজের নিম্নবর্গে মিশনারীরা পেয়ে বিস্তারের এক চমৎকার উর্বর ক্ষেত্র। কিন্তু ধর্মবিস্তারের সুযোগ। পাশ্চাত্য হিতবাদ, যুক্তিবাদ, উদারনীতির গেলে চাই অর্থ। বেসরকারী প্রয়াসে — বিশেষ করে কেরী মার্শম্যানের মত মিশনারী চেষ্টায় — শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে সত্য। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা মরুতে শিশির বিন্দু মাত্র। ১৮১৩ সালে ঘরে-বাইরে প্রবল চাপের ফলে কোম্পানীর কৃপণ মুষ্টি শিথিল হলো কিছুটা। কোম্পানীর বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হলো বার্ষিক এক লক্ষ টাকা। এই প্রথম। প্রবল তৃষ্ণায় অন্তত এক ফোঁটা জলের আশ্বাস। চার্চার এ্যাক্টে বলা হল, ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যের পুনরুজীবন ও উন্নতি, "শিক্ষিত নেটিভদের" উৎসাহ প্রদান এবং অধিবাসীদের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। চার্টার এ্যাক্টের প্রণেতারা তখনো ভারতীয় সাহিত্য বলতে আরবী-ফার্সী ও সংস্কৃত বুঝত; আর "শিক্ষিত নেটিভ" বলতে বোঝাতো ঐসব ভাষা-সাহিত্যে পারঙ্গম ব্যক্তিদের। কিন্তু তার পরেই এক মহাবিতর্ক উঠলো ইংলণ্ড ও ভারতে: কোন্ শিক্ষায় ব্যয় করা হবে এই অর্থ? এক দল প্রাচ্যবাদী। তাঁরা চান সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা, হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ার মত প্রাচ্য ভাষা-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হোক এই অর্থ। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে প্রাচ্যভাষাতেই চর্চা করা হোক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সাহিত্য দর্শন ধর্মনীতি ইত্যাদি আধুনিক প্রজ্ঞার শাখা-প্রশাখা। মার্শম্যান ত স্পষ্টভাষাতেই বলেছিলেন মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া শিক্ষা বিস্তারের যে কোন প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। অপর দল পাশ্চাত্যবাদী। তাদের দাবী সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে হবে পাশ্চাত্য অর্থাৎ একমাত্র ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনে। শিক্ষার মাধ্যমও হবে ইংরাজী। ইংরাজী শিক্ষা এদেশের যুগ যুগ ব্যাপী অন্ধত্ব ঘোচাবে, অসংখ্য ধর্মীয়-সামাজিক-নৈতিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করবে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, বিবিধ মানবিক ভাবধারার সঞ্জীবনী পরশ পেয়ে ভারতবাসীরা প্রকৃতই সভ্য ও আধুনিক হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রামমোহনের মত একদল হিন্দুও ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার দৃঢ় সমর্থক।

বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমেই মনে রাখা দরকার, সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রয়োজন ছিল ইংরাজীতে কোন রকমে কাজ চালাতে সক্ষম এমন বেশ কিছু কলমচির। সাম্রাজ্যের প্রসার ও বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখা-প্রশাখা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রয়োজনও বাড়ছিল। প্রশাসনে প্রার্থিত যোগ্যতা, সংহতি ও গতিশীলতা আনার প্রয়োজনে ইংরাজী প্রচলন তাই জরুরী হয়ে পড়েছিল। তার চেয়েও কম জরুরী ছিল না রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দাসত্বকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ভাষাগত সাংস্কৃতিক দাসত্বকে একেবারে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। অন্যদিকে রামমোহনের মত কিছু বহু-ভাষাবিদ অথবা ইংরাজী-জানা সম্পন্ন মানুষেরা পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রচলিত দেশজ শিক্ষার অপকৃষ্টতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিলেন। তাছাড়া মুসলিম শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফার্সীর গুরুত্বহানি এবং তার প্রাসঙ্গিকতার বিলোপ আর ইংরাজ শাসনে ইংরাজী শিক্ষার মধ্যে বৈষয়িক উন্নতির অপার সম্ভাবনা উচ্চবর্গের হিন্দুদের একটা

উল্লেখযোগ্য অংশ সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার প্রতি এদের সমর্থন ছিল আন্তরিক। অন্যদিকে শাসনক্ষমতা বঞ্চিত এবং ওয়াহাবী ফেরাইজী আন্দোলনের মুসলিম অভিজাত নেতৃত্ব ইংরাজী শিক্ষাকে "হীলাল" জ্ঞান করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এর প্রতি। তাতে অবশ্য উচ্চবর্গের হিন্দুদের সুবিধাই হলো। আত্মোন্নতির পথ হলো নিষ্কন্টক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন।

ইংলণ্ড ও ভারতে যে সব ইংরাজ ভারতে প্রাচ্যশিক্ষার বদলে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন, এবং যাঁদের হাতে ছিল নীতি প্রণয়নের অধিকার তাদের সবাই যে প্রাচ্য ভাষা সাহিত্যে এক-একজন মহাদিগগজ ছিলেন তা মনে করার কারণ নেই। মেকলের মত স্বীকৃত শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ তাঁর বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদনে লিখেই ফেল্লেন, গুণগত বিচারে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য এতই নগণ্য যে ইউরোপের যে কোন গ্রন্থাগারে একটি মাত্র তাকে একে অনায়াসে গুঁজে দেওয়া সম্ভব! প্রাচীন আরবী, ফার্সী, ভারতীয় ও চীনা জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পর্কে এতোটা অজ্ঞতা সম্ভবত হিমালয়ের উচ্চতাকেও ছাপিয়ে যায়। প্রাচ্যের দোষ-ত্রুটিগুলো তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতেন, জানতেন না জ্ঞানরাজ্যে এর অপার ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যের কথাটি। ইংরাজ আমলের বহু আগে থেকে, সম্ভবত সুলতানী যুগ (আসলে যা মধ্যযুগ) থেকে, এদেশে শীর্ণ হলেও একটা বিস্তৃত জনশিক্ষার ধারা যে বর্তমান ছিল একথা কেউ কেউ সামান্য জানলেও অনেকেই জানতেন না। যাঁরা জানতেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উইলিয়াম এ্যাডাম—যাঁর কথা আমরা পরে বলবো। তিনি ও অন্যান্য প্রাচ্যবাদীরা অরণ্যে রোদন করে গেলেন, কিন্তু ঘটনার নিয়ামকরা তাঁদের কথা কানে নিলেও মস্তিষ্কে স্থান দিলেন না। সুতরাং মিল-বেন্থামের মন্ত্রশিষ্য বেন্টিঙ্ক-মেকলের দল ১৮২৯ সালে এমন একটি আইন পাস করলেন যাকে বলা যায় যুগান্তকারী। স্থির হলো, শিক্ষাখাতে বরাদ্দ পুরো টাকা ব্যয়িত হবে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে। ইংরাজীই হবে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের গূঢ় উদ্দেশ্য মেকলে অবশ্য গোপন করেননি। তিনি তাঁর 'এডুকেশনাল মিনিটে' পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরী করতে চেয়েছিলেন যারা হবে "রক্তে এবং বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজ।" এক কথায় দেশীয় মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে এরা হবে এক ধরণের বর্ণাঢ্য (এদের বর্ণে অবশ্য থাকবে কালো এবং বাদামির প্রাধান্য) প্রাণী দেশে-বিদেশে আজও যা উচ্চ মূল্যের পণ্য। আত্মিক দিক থেকে ছিন্নমূল, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থমগ্ন, সমাজবিমুখ এইসব প্রাণীদের পেছনে আজকের মা-বাবাদেরও কী অপরিসীম উদ্যম, আত্মত্যাগ ও অর্থক্ষয়! ১৮৩৫ সালের আইন দেশজ শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর এক প্রাণঘাতী আঘাত হানলো। প্রাণের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা নিঃশেষিত হলো ১৮৪৪ সালে হার্ডিং-কৃত আর একটি আইনের বলে। স্থির হলো, এখন থেকে ইংরাজী জ্ঞান (গুনমানে তা যতোই নিচু হোক) হবে সরকারী চাকরির অপরিহার্য প্রবেশপত্র। এই ভাবে দেশজ শিক্ষাধারার অন্তেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হলো বলা চলে।

উপরে বর্ণিত বিস্তৃত পটভূমি মাথায় রেখে এবার ফিরে তাকাবো উনিশ শতকের বাংলা তথা বীরভূমের শি দিকে। দেশজ শিক্ষাধারার অন্তেষ্টি-পর্ব অনুসরণ করে আলোকপাত করবো পরবর্তীকালের সরকারী শিক্ষানীতির যদিও তা হবে বিদ্যুৎ চমকের মত চকিত ও আংশিক আলো

২. বীরভূমের দেশজ শিক্ষা ধারা :

সেকালের জেলা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে যাঁরা হতেন শাসনাধীন অঞ্চল সম্পর্কে যতোটা সম্ভব খুঁটিনাটি রাখার চেষ্টা করতেন তাঁরা। তাঁদের চিঠিপত্র প্রতিবেদনে নির্ভর করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রচনা করতেন আশু ও কর্মসূচি। তবে অধস্তন কর্মকর্তারা সব সময় যে প্রকৃ জানতে ও জানাতে সক্ষম হতেন তা নয়। মাঝে মাঝে নি ব্যর্থতা ও অজ্ঞতাকে ঢাকবার জন্য স্বকপোল কল্পনার নিতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না। তাদের অজ্ঞতা বি প্রকাশ পেত দেশীয় শিক্ষাধারা সম্পর্কে। উদাহরণ স্বরূপ, সালে শিক্ষাখাতে বাৎসরিক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার সি দশ বছর পরেও (১৮২৩) কলকাতার পাবলিক ইন্ কমিটিকে জেলার লোকাল এজেন্ট এক পত্র মারফত "...এই জেলায় যুবকদের শিক্ষার জন্য কোন সরকারী-কে বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান নেই।" তিনি যদি কেবল সরকারী বি মধ্যে নিজের মন্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলে বল ছিলনা। কিন্তু গোল বাঁধলো দেশীয় বিদ্যালয়কেও তাঁর বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত করাতে। বাস্তব অবস্থা হলো, তাঁর পত্র বহু যুগ আগে থেকেই এক দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা বাংলার জেলার মত বীরভূমে যে ব্যাপকভাবে চালু ছিল তা নজরে পড়েনি, অথবা তিনি তাকে কোন আমলই দেননি ১৮১৩ সালের আইনের পরে দেশজ শিক্ষা পদ্ধতি সরকারী-বেসরকারী স্তরে কৌতূহল জাগ্রত হচ্ছিল। সরকারী নির্দেশে উইলিয়ম এ্যাডাম নামে এক উচ্চপদস্থ অ উপর ন্যস্ত হলো এ বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের দায়িত্ব।

বাংলা-বিহারে প্রচুর শ্রম ও বিস্তৃত পরিভ্রমণের ফ দেশজ শিক্ষাধারা সম্পর্কে ১৮৩৫, '৩৬ ও '৩৮ সা খণ্ডে প্রকাশিত এ্যাডামের সুদীর্ঘ তিন প্রস্থ অনুপুঙ্খ প্র একনিষ্ঠ মিশনারী এ্যাডাম ছিলেন একজন প্রাচ্যপন্থী। প্রাচ্যপন্থীদের মত তাঁরও অভিমত ছিল কোম্পানীর শি বরাদ্দকৃত অর্থ একমাত্র দেশীয় ভাষাতেই ব্যয় করা উচি মতে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মত আধুনিক সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটাতে হবে। তিনি বিশ্বাস শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ এবং জনশিক্ষার এটাই একমাত্র পথ আগেই দেখেছি এক-চোখো পাশ্চাত্যবাদীদের কাছে স্বীকৃতি পায়নি। ইংরাজী শিক্ষাই হয়েছিল শিক্ষার মাধ সরকারের বরাদ্দ-কৃত স্বল্প পরিমান অর্থের সবটুকুই ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ও বিস্তারে। ইংরাজী শিক্ষা

কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সুফল ফলিয়েছিল অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে বিগত প্রায় দু'শ বছরের অভিজ্ঞতার নিরিখে এর পর্বত-প্রমাণ ব্যর্থতা ও সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া বিষাক্ত ক্ষতের মত স্পষ্ট। আধুনিক কালেও এর প্রভাব আমাদের চিন্তাজগৎ ও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রেখেছে। এই কারণে দেশজ শিক্ষাধারার পুনরুদ্ধার করে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে প্রস্তাব এডাম সেদিন দিয়েছিলেন একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসেও তার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

এডাম তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, তাঁর অনুসন্ধান কালে মোট-হিসাবে গ্রামের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। অধিকাংশ গ্রামেই একটি করে পাঠশালা বা প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সংখ্যা এক লক্ষ। আরো চার ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল এখানে: টোল বা চতুষ্পাঠী, আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়, মক্তব আর মাদ্রাসা। আমরা এদের একে সংক্ষেপে এনিয়ে আলোচনা করবো।

বীরভূমের তৎকালীন সতেরটি থানার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য যে থানাটি এ্যাডাম বেছে নেন সেটি হলো নাঙ্গুলিয়া। অধীনস্থ গ্রামের সংখ্যা ২৬৭; প্রতি গ্রামে গড়ে ৩৪টি পরিবার ধরে পরিবারের সংখ্যা ৯,১১৭। হিন্দু পরিবার ৭,২১৭টি, মুসলমান ২,৯৭৭, সাঁওতাল ৪,২৬১ আর ধাঙ্গর ১৮৯ জন। মুসলমান, সাঁওতাল ও ধাঙ্গরের মিলিত সংখ্যা হলো হিন্দুদের ২০.৫ শতাংশ। জনসংখ্যার মধ্যে নারী-পুরুষের হিসাবও তিনি করেছিলেন: সব বয়সের পুরুষের সংখ্যা ২৩, ৩১৬ আর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২২, ৯২০। প্রতি ১০০০ জন পুরুষে কিছু ৯৭৫ জন স্ত্রীলোক। এদের মধ্যে বারো বছরের নিচে, পাঁচ ও চোদ্দ বছরের মাঝামাঝি আর পাঁচ বছরের নিচে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা এবং তাদের গড়ও তিনি নির্ণয় করেছিলেন সংক্ষিপ্তবোধে আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না। যেটুকু উল্লেখিত হলো তার উদ্দেশ্য — এ্যাডামের অনুসন্ধানের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে কিঞ্চিৎ ধারণা দেওয়া।

এখানে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। নাঙ্গুলিয়া থানাকে কেন্দ্র করে তিনি যে অনুপুঙ্খ চিত্র এ্যাডাম একেছেন তার সঙ্গে বীরভূমের অন্যান্য থানার কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তৎকালীন পুঁথি ও চিঠিপত্রে আমরা তারই এক অভিন্ন চিত্র পাই।

(ক) পাঠশালার শিক্ষা:

পাঠশালার শিক্ষা বলতে প্রথমেই ঘরের কথা আসে। বড় অনিশ্চিত ও দৈন্যদশা পাঠশালা ঘরগুলোর। পাঠশালা বসে কখনো মন্দির-প্রাঙ্গনে, মসজিদের চাতালে, চন্ডীমন্ডপ বা ধর্মরাজতলায়। কোথাও জমিদার বা সহৃদয় কোন সম্পন্ন গৃহস্থের সৌজন্যে এক ফালি জায়গা পেলে সেখানে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে, ছাত্রদের স্বেচ্ছাশ্রমে ঘর তৈরী হতো। এ্যাডাম একটি গ্রামের কথা লিখেছেন যেখানে ছাত্রদের স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে একটা মাটির ঘর খড়ের চালা ছাউনী করতে খরচ পড়েছিল ১ টাকা ৮ আনা। তাল-কাঁড়ির কড়িবরগা, বাঁশের ছাউনি — স্থানীয় ভাষায় বলে করামি। চারখানা বাঁশের খুঁটির ওপর কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকা খড়ের এক চালা দো চালাও ছিল — গ্রীষ্ম-বর্ষায় খড় উড়ে গেলে বা পচে গেলে শিক্ষক-পড়ুয়ার পড়ায় বিশেষ বিঘ্ন হতো না। কখনো পাঠশালা বসে বট বা পাকুরের স্নিগ্ধ ছায়ায়, কখনো কোন ন্যাড়া গাছের তলায়, বীরভূমের গ্রীষ্ম-তপ্ত ভয়ঙ্কর রাগী আকাশের নিচে। সেটাও তেমন ধর্তব্যের বিষয় নয়: পড়া আর পড়ানোই ছিল আসল কথা। গোশালাতেও পাঠশালা বসতো, অথবা গুরুমশাই এর উঠোনে বা সঙ্কীর্ণ দাওয়ায়। মুদি দোকানের নগ্নগাত্র বেত্রধারী কঠোর গুরুমশাই খদ্দের সামলাবার ফাঁকে ফাঁকে পড়ান (স্মরণ করুণ সত্যজিৎ-কৃত পথের পাঁচালীর সেই অবিস্মরণীয় অপুর পাঠশালার গুরুমশাইকে), দশ-এগারো বছর বয়সের পড়ুয়াদের অমনোযোগ বা শিশু-সুলভ চাপল্য-দমনে মেঘ-গর্জনের মত তাঁর ত্রাস-সঞ্চারী হুঙ্কার এবং অপর্যাপ্ত গালাগালির শিলাবর্ষণ ছাড়াও তাঁর শাসনদণ্ড প্রায়শ পড়ুয়াদের পিঠ ভাঙ্গতো! পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত এক পুঁথিতে জনৈক গুরুমশাই "পড়িবার কালে কত কিল লাথি খাওয়ার" আগাম "প্রতিশ্রুতি" দেন। সাধারণভাবে গুরুমশাই-পড়ুয়ার সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের। গুরুতর প্রহারে পড়ুয়ার দেহ রক্তাক্ত হলে পাচন হাতে অভিভাবক তেড়ে আসতেন না। গুরুমশাই-এর উপর এমনই ছিল তাঁর আস্থা। প্রহারের মাত্রা কিছুটা বেশি হলে অভিভাবক বরং খুশিই হতেন। ভাবখানা ছিল — যাক, তাঁর ছেলেটা গুরুমশাই-এর নজরে পড়েছে যখন, দু'চার পাতা অন্তত লিখতে-পড়তে শিখবে নিশ্চয়!

শিক্ষকতা তখনও ব্যবসা হয়ে ওঠেনি। "বিদ্যা বিক্রয়" তখনও নিন্দনীয় কাজ বলেই গণ্য হতো। বিদ্যাদানের মহান আদর্শ গ্রহণ করে অনেকে তাই বিনা বেতনেই পড়াতেন। তাঁদের জীবন-ধারণের জন্য ছিল ভিন্ন জীবিকা। কেউ চাষ-বাস করতেন, পূর্বোল্লিখিত গুরুমশাই-এর মত কেউ চালাতেন মুদি দোকান, কেউ ব্যবসায়ীর দোকানে হিসাবের খাতা লিখতেন, কেউবা করতেন অন্য কোন শ্রমসাধ্য কাজ। একান্নবর্তী পরিবারে সংসারের কোন আর্থিক দায় বহন না করে পড়ুয়াদের পাঠ দিতেন এমন ব্যক্তি দুর্লভ ছিল না। তার ফলে পরিবারের রোজগেরে সদস্যদের মধ্যে ঈর্ষা ক্ষোভ অশান্তির বড় ধরণের ঝড়ের সঞ্চার হতো এমন খবর আমাদের জানা নেই। গুরুমশাইয়ের উচ্চ সামাজিক মর্যাদা অটুট ছিল বলে পরিবারের মধ্যে বাহ্যত গর্ববোধই ছিল। দারিদ্র্যবশত অনন্যোপায় কেউ কেউ বেতনও নিতেন। কিন্তু তার পরিমান বর্তমান নিরিখে এতোই নগণ্য ও লজ্জাকর যে তার উল্লেখ শোভন হবেনা! ১৮৪৮ সালে একটি চিঠিতে বীরভূমের কালেক্টার রীড লেখেন, অভিভাবকরা শিক্ষকমশাইকে নগদে দু'চার পয়সাও দিতে রাজী নয়। তারা বরং কিছু ধানচাল দিত প্রণামী হিসাবে। তাছাড়া কখনো সিধে আনতো কোন পড়ুয়া, কলাটা মুলোটা কুমড়োটা দিয়ে যেত কেউ কেউ। তাতে গুরুমশাই সহ গুরুপত্নীও খুব খুশি। এ্যাডামের হিসাব অনুযায়ী একজন শিক্ষকের মাসিক আয় ছিল সর্বসাকুল্যে ৩ টাকা ৩ আনা ৯ গন্ডা। তুলনায় একজন চাপরাসীর মাসিক বেতন ৪ টাকা। বেশি বেতনভুক

হলেও চাপরাসী চাপরাসীর মতোই থাকতো আনত মস্তকে, আর কম বেতনের গুরুমশাই থাকতেন সমুন্নত শিরে।

তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বণিক শাসনের বিস্তার ও সংহতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব ক্ষেত্রের মত শিক্ষাতেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে বৈকি! বিদ্যাদান পরিবর্তিত হতে থাকে বিদ্যা-ব্যবসাতে। এ-বিষয়ে ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি লিখিত (বাংলা ১২৬৬ / ইংরাজী ১৮৫৯) পঞ্চানন মণ্ডল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক দুটি দলিল আমাদের হাতে দিয়েছেন। একটি পাট্টাপত্র, অপরটি কবুলিয়ত। পাট্টাপত্রে "শ্রী শ্রী হরিকে" মস্তকে ধারণ করে নওপাড়া গ্রামের "শ্রী সেখ কালাচাদ" "মহামহিম শ্রীযুক্ত সনাতন সরকার বরবরেষু" লেখেন যে, তাঁর দুই পুত্রকে "লেখাপড়া করিবার কারণ পাঠ কেলট্র ক ট হরফ খাতাসোহী ও হিসাবনিকাশ বাঙ্গালার হিসাবে এবং হরফে পুরা কোরিয়া....আর বাঙ্গালার স্বর আ আঁকজোঁকে তৈয়ার কোরিআ" দেবেন। সময়-সীমা বাংলা ১২৬৬ সন থেকে ১২৬৭ সনের "মাহ আশ্বিন তক"। কার্যকালে পাট্টাদাতা গুরুমশাইকে দক্ষিণাবাবদ প্রতিমাসে দেবেন আট আনা করে। পাঠদান সমাপ্ত হলে হিসাব-নিকাশ করে দেবেন। "মোট চুক্তি সর্ব্বশুদ্ধা ২৫ পোচিষ টাকা।" কিন্তু "করারের ভিতর [পড়ুয়াদের] তৈয়ার কোরিয়া না দীতে" পারলে পাট্টাদাতা তাঁর কাছ থেকে টাকা ফেরৎ নেবেন এবং ফেরৎ পাওয়ার পর একরারের পিঠে রসিদ লিখে দেবেন।

অপর পক্ষ কাচগড়্যা গ্রামের গুরুমশাই শ্রী সনাতন সরকার "শ্রী শ্রী দুর্গাকে" স্মরণ করে তাঁর কবুলতিপত্রে জানান যে, নওপাড়া গ্রামে "চৌপাড়ী" পাঠশালায় তিনি "স্বরকারী কর্ম্মো" করছেন। একরারপত্র মারফত তাঁর প্রতিশ্রুতি হলো, শ্রী সেখ কালাচাঁদের দুই পুত্রকে "পাঠ কেলট্র ক ট ইস্তক সন ১২৬৬ সাল নাগাইত সন ১২৬৭ সালের মাহ শ্রাবণ তক পাঠ হরফ খাতাসোহী ও হিসাবনিকাশী কর্ম্মে তৈয়ার করিয়া" দেবেন। বিনিময়ে তিনি পাবেন "মাহিনা মায় খোরাক পোষাক শুদ্ধ ২৬ ছাব্বিশ টাকা।" তিনি আরো লেখেন, "উক্ত ছাত্র দিগের ত্বয়ার না কোরিআ দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফেরৎ দিবো।" পুত্রদ্বয় যদি "গাভালি [গাফিলতি] কোরিআ কামাঞ্চী করে এবং অন্য কোন উজর হয়" তবে তিনি অভিভাবককে কলকাতা মোকামে চিঠি লিখে জানাবেন। কাজ সম্পন্ন করতে পারলে পাট্টাদাতা মাইনে নেবেন, কিন্তু "এই কর্ম্মে আমার গাফিলতি হয় তবে আমি চুক্তির টাকায় বাদ দিব...।" অর্থাৎ গৃহীত টাকা ফেরৎ দেবেন। পুরোপুরি ব্যবসায়িক নীতি অনুযায়ী ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে এটি একটি সমভিত্তিক চুক্তি। নীতিবর্জিত শিক্ষা-বিক্রেতার ইচ্ছাকৃত কর্তব্যচ্যুতির বিরুদ্ধে এটিকে একটা আদর্শ ব্যবস্থা বলা যায়। (শিক্ষক হিসাবে নিজেকেই প্রশ্ন করি: ভারতের বর্তমান শিক্ষা জগতে এরকম একটা ব্যবস্থা থাকলে কেমন হয়?)

শিক্ষকরা হত দরিদ্র আগেই বলেছি। এঁরা ছিলেন সব বর্ণও ধর্মের। বলা নিষ্প্রয়োজন, হিন্দু শিক্ষকরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। হিন্দুদের মধ্যে আবার অধিকাংশ কায়স্থ। এছাড়া ছিলেন সদ্ ও সুবর্ণ বণিক। ব্রাহ্মণ বৈদ্যরাও ছিল। মুসলমান শিক্ষ সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিলনা। পাঠশালার পড়ুয়াদের অধি দরিদ্র পরিবারের। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ ও সুবর্ণ বণি ছিল সংখ্যাধিক্য। মুসলমান ও তথাকথিত নিচুজাতের পড়ু ছিল। এ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, "নিচু জা শিশুরা বেশি সংখ্যায় পাঠশালায় যাচ্ছিল। এটি একটি নি শুভ লক্ষণ। পাঠশালার ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কোন সাম্প্রদ ও বর্ণগত বিদ্বেষ-বিচ্ছিন্নতা ছিলনা। এটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ

সাধারণ মানুষের এই পাঠশালাগুলো ছিল পুরোপুরি স্বতন্ত্রও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাধারা। মাতৃভাষা ছিল শিক্ষার মা মাতৃভাষার প্রথম হাতেখড়ি হতো শিশুর পাঁচ বা ছ'বছর ব পাঠশালার পড়ুয়াদের গড় বয়স প্রায় সাড়ে দশ। প্রথমে অ অক্ষর পরিচয়। বর্ণ পরিচয় হতো অক্ষরের মাধ্যমে। অ পড়তে ও লিখতে শেখা। বোর্ড বা শ্লেটের বালাই ছিল মাটিতে বা বালিতে বড় আকারে, পরে কলাপাতা বা শালপ অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে, গুরুমশাই অক্ষর লিখে দি ছোট শিশু তাতে আঙুল বুলিয়ে বা খড়ি দিয়ে অভ্যাস কর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি বা ঊনিশ শতকের প্রথম ছাপা বইয়ের কথা জানা যায় না। হাতে লেখা পুঁথিতে অক্ষর পরিচয়। ৩৪টি অক্ষর নিয়ে হাতে লেখা পুঁথি ব করা হতো। প্রথমে থাকতো ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষর, পরে স্বরব শিশুর কাছে মনোগ্রাহী করার জন্য প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে থাক দুটি করে ছন্দোবদ্ধ বাক্য বা ছড়া। পঞ্চানন মণ্ডল সম্প "পুঁথি-পরিচয়-এর প্রথম খণ্ডে" অক্ষর বর্ণনি" (লিপিকাল ১২ নামে একটি অক্ষর শেখার বিবরণ আছে। সেখান থেকে মাত্র উদাহরণ: "ক: বলে কৃষ্ণ কথা শুন এক মন / কহিব কৃষ্ণের চৌত্রিশ অক্ষর লঞা। খ: বলে খেতি [ক্ষি তলে মনসা দেহ প্যাঞা / খানিক থাকরে ভাই সাধু লঞা" ইত্যাদি। সেকালে ব্যবহৃত অক্ষরের সংখ্যা নিয়ে বি বিতর্ক আছে। আমরা তার ভেতরে যাচ্ছি না। আগেই ব ব্যঞ্জন বর্ণের পরে স্বরবর্ণ শেখাবার রীতি ছিল। সম্ভবত মোহন তর্কালঙ্কারের "শিশুশিক্ষা" থেকেই প্রথমে স্বরব পরে ব্যঞ্জন বর্ণ শেখাবার রীতির প্রচলন। কিন্তু বীরভূমের পূর্ব প্রথাই চালু ছিল বহুকাল।

অক্ষর পরিচয়, বর্ণমালা ও বানান শেখানো হতো সঙ্গে। তারপরে লেখা ও পড়া। বিশেষ জোর দেওয়া হ হস্তাক্ষরের ওপর। লেখার সময় বসার পদ্ধতি সম্প গুরুমশাই-এর পুঁথিতে নির্দেশ থাকতো।' "ঘাড় বাকা হ অক্ষর হয় বাকা / ইহা জানি লেখাপড়া কর সভে শি অক্ষর পরিচয়, বাংলায় লেখা ও পড়া ছাড়া শেখানো হ কিছু অঙ্ক এবং "সেহা" বা দৈনন্দিন ও দীর্ঘমেয়াদী জী পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক বিভিন্ন হিসাব করার কৌ পঞ্চাননন মণ্ডল লিখিত "চিঠিপত্রে সম্বোধন" এবং বিভিন্ন

রয়েছে একটি "বাহিদা" বা কড়চার বিবরণ। প্রাপ্তিস্থান বীরভূমের [illegible] গ্রাম। তাতে পাঠশালা শিক্ষার ৯৮ প্রস্থ হিসাবে অন্যান্যর মধ্যে রয়েছে ক, খ, বানান, অঙ্ক, পত্রলেখা, গ্রামের নাম, নিজ বা অন্যের নাম লেখার ধারা, জমা-উশুল-বাকি, খাজনার রসিদ, খত, পাট্টা ও কবুলিয়ত লেখা, গোমস্তার হুকুমনামা। এসব ছাড়াও আছে আরো নানা ধরণের লেখা ও হিসাবের পদ্ধতি। "শুভঙ্করের আর্যা" নামে সুপরিচিত হিসাবের পদ্ধতিও পাঠশালায় মুখস্ত করানো হতো। ছন্দোবদ্ধ বলে সেগুলো মুখস্ত করা সহজ হতো, শিশুরাও মজা পেত। বাস্তবিক, ছড়ায় রচিত "শুভঙ্করের আর্যা" ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে ছিল খুবই প্রয়োজনীয়।

পাঠশালার এই শিক্ষাপদ্ধতি থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অত্যাবশ্যক জীবন-জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু কারিগরি কাজের শিক্ষা দেওয়া হতো সেখানে। পূর্বোক্ত "বাহিদায়" ঘর তৈরী, পুষ্করিনী খনন, ইঁদারা-কাটার মাপজোখ, ইটকালি, (কালি মানে দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ, পরিমাণ নির্ণয়), নৌকোকালি, দেওয়ালকালি ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অন্যান্য পাঠশালায় গুরু গিরি, পুঁথি নকল করার শিক্ষাও দেওয়া হতো। এগুলো একদিকে যেমন বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্যদিকে, এবং আসলে, ছিল পুরোপুরি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক শিক্ষা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পাঠশালার শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কী? এর গুরুত্বই বা কোথায়? আসলে পাঠশালা-শিক্ষা ছিল, যে কথা আমরা বারংবার উল্লেখ করেছি, গরীব-সাধারণের শিক্ষা। এটি গণশিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এর একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃভাষায় ঐসব গরীব ও মাঝারি আর্থিক স্তরের ছেলে-পুত্তুয়াদের হাতে এমন কিছু হাতিয়ার তুলে দেওয়া যাতে তারা পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে একই সঙ্গে জীবিকার সংস্থান ক'রে সমাজের বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও অংশ নিতে পারে। মনে রাখতে হবে, ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হবার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত, দেশটি ছিল বিভিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের সমষ্টিমাত্র — যদিও বিবিধ কারণে (মূলত অর্থনৈতিক কারণে) এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সূত্রপাত থেকে, ফাটল ধরছিল তার পরিকাঠামোয়। পাঠশালা-শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক এই পরিকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ তৈরী করা। টোল, মক্তব-মাদ্রাসাও এই পরিকাঠামোর অংশ ছিল। উদ্দেশ্য সিদ্ধও হচ্ছিল মোটামুটি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে ক্রমান্বয়ে বর্গীর হাঙ্গামা, সুদূর-প্রসারী রাজনৈতিক উথাল-পাথাল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, অর্থনৈতিক ভাঙন, বণিক পুঁজির ব্যাপক অনুপ্রবেশ, পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন এবং তারই হাত ধরে গ্রামজীবনের গভীরে মহাজনী শোষণের শিকড়জাল বিস্তারের মধ্য দিয়ে গ্রাম সমাজের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বিনষ্ট হলো, গ্রামগুলো মৃতপ্রায় হলো, মরেই গেল কত গ্রাম গঞ্জ। কিন্তু কোন কোন গ্রাম-গঞ্জ মরলেও সব মরেনা, "মানুষ" মরেনা, সমাজও মরে না চিরকালের মত। একদা-পরিত্যক্ত পতিত জমিতে মানুষ আবার গ্রামের পত্তন করে, আশু ও দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন মেটাতে তৈরী করে সমাজ, হয়তো পুরনো গ্রামের পাশে নতুন গ্রাম, তার নতুন সমাজ। পুরনো হোক, নতুন হোক, মনুষ্য-সমাজের অনেক চাহিদা তো চিরন্তন, যেগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচেনা। আগেকার চাহিদা ও প্রয়োজনগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্রিটিশ শাসন ও তার দোসর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মহাজনী প্রথা এবং অর্থনৈতিক সীমিত সচলতার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট বহু ছোটখাট অথচ অত্যাবশ্যক কর্মের সুযোগ। ঘর তৈরী, পুকুর কাটা, ইঁদারা তৈরী, ইঁটভাঁটা পোড়াবার কাজ, জমিজমার মাপ-জোখের কাজ আগেও ছিল, এখনও রইলো। নতুন করে সৃষ্টি হলো নব জমিদার ও মহাজনদের সেরেস্তার কাজ, ছোট ছোট বহু দোকানপাটের হিসাব রাখার কাজ, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় জটিলতা-প্রসূত জমিদার ও প্রজাদের পাট্টা-কবুলিয়ত লেখার মত বৃত্তি-ভিত্তিক কাজ, জমিদার ও সরকার বাহাদুরের জেলা প্রতিনিধিদের কাছে নানা অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আবেদনপত্র বা আর্জি লেখার কাজ। এ ধরনের আরো বহু কাজকর্মের ফিরিস্তি দিয়ে পাতা ভরানো সম্ভব। এসব কাজের জন্য পাঠশালার শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট। এমনকি পাঠশালায় শেখা সেকালের অসংস্কৃত ও বিকৃত বানানে, যতিচিহ্নহীন অসংবদ্ধ, সকল ভাব-প্রকাশের অক্ষম ভাষাতেই ঐ শিক্ষা-প্রাপ্ত মানুষেরা জমিদারের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর্জি লিপিবদ্ধ করে জেলা সদরে পাঠায়। প্রতিকার না পেয়ে ১৭৮৫-৯৩ সাল ব্যাপী বীরভূমের বিস্তৃত অঞ্চল ধরে এক ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। গ্রামের মণ্ডলদের লিখিত ও সাক্ষাৎ এধরণের অন্তত আধ ডজন আর্জিপত্র আমাদের হাতে এসেছে। এসব দেখে যাঁরা দাবী করেন পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো না পেলে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার চেতনা ও আন্দোলন কোন কালে অঙ্কুরিত হতো না, বিস্তারও ঘটতো না — তাঁদের সিদ্ধান্তের অকাট্যতা সম্পর্কে মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে। পরিশেষে পাঠশালা বিষয়ক আলোচনায় যতি টানতে গিয়ে আমাদের একথাই মনে হয়, তথাকথিত এলিট শিক্ষার মাধ্যমে নয়, গ্রাম-শহরের গরীব নিরক্ষর মানুষের দৈনন্দিন ও দীর্ঘ-মেয়াদী প্রয়োজনের কথা মনে রেখে তাদের জীবন-জীবিকায় সহায়ক কোন সহজ আট পৌরে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই জনশিক্ষার প্রয়াস সার্থক হতে পারে। বলা বাহুল্য, একমাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীই হবে এ শিক্ষার চালিকাশক্তি।

(খ) টোল, আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়; মক্তব ও মাদ্রাসা:

পাঠশালা শিক্ষাধারা সম্পর্কে মোটামুটি দীর্ঘ আলোচনার পর হিন্দু-মুসলিম উচ্চকোটির মানুষের স্বতন্ত্র এই শিক্ষাধারা সম্পর্কে আমরা এখানে খুবই সংক্ষেপে আলোচনা করবো। বারান্তরে

এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার ইচ্ছা রইল। বর্তমান প্রবন্ধে এদের নিয়ে স্বল্প আলোচনার জন্য স্থানাভাব একটি বড় কারণ হলেও এর মুখ্য কারণ: সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেও বলতে হয়, এই শিক্ষাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন জেলার সমগ্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তবে এঁদের অনেকেই ছিলেন সমাজের বিদ্বজ্জন, সকলের সম্মান ও ভক্তির পাত্র। জেলার সারস্বত সাধনার ঐতিহ্যবাহী সাধকবৃন্দ।

টোল-চতুষ্পাঠীতে পড়ানো হতো বেদ, উপনিষদ, বিবিধ শাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। একমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও বৈষ্ণব ছাত্ররাই পাঠ গ্রহণের সুযোগ পেত। অন্যদের জন্য দরজা বন্ধ।

এ্যাডামের প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলার সংস্কৃত বিদ্যালয় বা টোল-চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ছিল ৫৬। ছাত্রসংখ্যা ৩৯৩। দুটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে টোলগুলো ছিল এক-পণ্ডিত পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। ব্যতিক্রম দুটির একটিতে পিতা-পুত্র শিক্ষাদান করতেন, অপরটিতে মামা-ভাগ্নে। পণ্ডিতের মোট সংখ্যা ৫৮। ৫৩ জন ছিলেন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, ৪ জন বারেন্দ্র, ১ জন বৈদ্য। অন্যান্য শাখার শিক্ষকদের তুলনায় এই পণ্ডিতদের বয়স ছিল ৪৫ বছর ৬ মাস। বেশি বয়সের সঙ্গে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের একটা স্বীকৃত সম্পর্ক ছিল। বিদ্যাবিক্রয়ের প্রথা টোল-চতুষ্পাঠীতে ছিল অকল্পনীয়। উপকরণ সামান্য হলেও বিনামূল্যে ছাত্রদের খাওয়া-পরার দায়-দায়িত্ব পণ্ডিত মশাইরা বহন করতেন। অথচ তাঁদের আর্থিক অবস্থা ছিল একান্ত নড়বড়ে। কারোর সম্পত্তি বলতে ছিল কিছু নিষ্কর জমি, কারোর বা কোন এক বদান্য জমিদারের দয়া-দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত সামান্য সম্মান-দক্ষিণা। এ্যাডাম জানান, কোন কোন জমিদার টোল-চতুষ্পাঠীর নিষ্কর জমির অংশ বিশেষ জবরদখল করে নিয়েছিলেন। তাতে পণ্ডিতদের আর্থিক কৃচ্ছ্রতা আরো বৃদ্ধি পেত। জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিতদের সমাবেশ হতো বছরে একবার। সেখানে তাঁরা আমন্ত্রিত হতেন। জ্ঞান-পাণ্ডিত্য প্রকাশের সুযোগ ছাড়া সেখানে প্রাপ্তিযোগও ছিল। প্রাপ্তিযোগ বলতে উপহার ও সম্মান-দক্ষিণা। অধিকাংশ সংস্কৃত পণ্ডিতের ওটাই ছিল জীবনধারনের মুখ্য অবলম্বন। আয়ুর্বেদাচার্য বৈদ্যদের আয় কিঞ্চিৎ বেশি ছিল সম্ভবত। এ্যাডামের বিবরণ অনুযায়ী এঁদের বার্ষিক গড় আয় ছিল ১০৮ টাকার মতো। মাসিক ৯ টাকা।

জেলার ভেতরে-বাইরে হিমালয় সদৃশ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার বিপুল খ্যাতি ছিল এমন চারজন সম্মানীয় ও শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করে এ্যাডাম তাঁদের পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন নানুরের জগৎদুর্লভ ন্যায়ালংকার। দ্বিতীয় জনের নাম বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্তবাগীশ। নিবাস কেতুগ্রাম থানার টিকুরি গ্রামে। (কেতুগ্রাম এখন বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও আলোচ্য সময়ে ছিল বীরভূমের অন্তর্গত।) তৃতীয় জন বিশ্বম্ভর বিদ্যারত্ন। কেতুগ্রাম থানার সোনাঝুড়ি গ্রামে বাড়ি, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষক। "চিকিৎসা গ্রন্থ চরক-সুশ্রুতের সমর্থন ও ব্যাখ্যা সহ সংস্কৃত ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তিনি।" এ্যাডাম উদ্ধৃতি। চতুর্থ জন রুক্মিনীকান্ত বিদ্যাবাগীশ। তাঁর রচিত বহু মধ্যে ১০০ পৃষ্ঠার "বনমালী চরিত্র-চন্দ্রিকা" নামে নাটকে এ্যাডাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। গদ্য-পদ্যের সং রচিত এই নাটক মূলত সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও বিভিন্ন চ সংলাপে ছিল প্রাকৃত, মাগধী, সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, পৈ অপভ্রংশ প্রভৃতি উপভাষা। অর্থাৎ উচ্চ বর্গ রচিত সংস্কৃত সা অনুপ্রবেশ ঘটছিল বিভিন্ন অঞ্চলের নিম্নবর্গে প্রচলিত প্রাকৃত উপভাষার। বাংলা বা ভারতের সাহিত্যের ইতিহাসে জানিনা, জেলার সাহিত্যের ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

জেলায় আরবী-ফার্সী পৃথক বিদ্যালয় ছিল। আরবী বিদ্যাল সংখ্যা মাত্র দুই। পড়ুয়ার সংখ্যাও নগণ্য — ৫ জন মাত্র। অ স্কুল দুটি ছিল পুরোপুরি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। কোরানের কিছু মুখস্ত করানো হতো সেখানে। লিখতে বা অঙ্ক কষতে শেখা কোন প্রমান নেই। শেখাবে কী — শিক্ষকরা সকলেই ছিল নিরক্ষর, পেষাগতভাবে মোল্লা। অন্যদিকে ফার্সী বিদ্যালয়গু ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। আরবী বিদ্যালয়ের তুলনায় তাদের সং বেশি — ৭১। ছাত্রের সংখ্যাও অধিক — ৪৮৫ হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের অনুপাত ছিল প্রায় সমান। এখানে দেওয়া হতো ভাষা ও সাহিত্যের ওপর। চিঠিপত্র, আর্জিলে পদ্ধতিও শেখানো হতো। সুতরাং এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকর ছিল যথেষ্ট শিক্ষিত। ফার্সী, রাজভাষার মর্যাদা হারালেও ব্যবহারিক অর্থনৈতিক মূল্য অক্ষুণ্ণ ছিল বহুকাল। ১৮৩৫ সা শিক্ষার মাধ্যম হলো ইংরাজী, কিন্তু '৪০ এর দশক পর্যন্ত ফার্সী প্রয়োজনও কিছুটা থাকে। টোলে পড়ার অধিকার কায়স্থদের ছিল কিন্তু উর্দু শেখার সুযোগ ব্রাহ্মণ-বৈদ্যদের সঙ্গে তারা সমান ভা গ্রহণ করে। এ্যাডামের প্রতিবেদন অনুযায়ী অর্ধেক হিন্দুছাত্র সংস্কৃত পড়তো বাকি অর্ধেক পড়তো ফার্সী। বীরভূম, মুর্শিদাবা বর্ধমান, বিহার ও ত্রিহুতের মোট ফার্সী পড়ুয়ার সংখ্যা ৩,৬৬ জন। তাদের মধ্যে ২,০৯৬ জনই হিন্দু। অর্থাৎ মুসলমান তুলনায় হিন্দু ছাত্রের সংখ্যানুপাত ছিল ৫৭.২ শতাংশ। ইংরাজ শিক্ষার মাধ্যম সরকারী কাজ পাওয়ার আশায় ধর্ম-নিরপে আরবী-ফার্সী বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠ-গ্রহণে অনীহা বৃদ্ধি পাচ্ছিল ক্রমবর্ধমান এই অনীহা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল উচ্চবর্ণে হিন্দু-ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে। ইংরাজী শিক্ষাকে চাক পাওয়ার নিশ্চিত পূর্বসর্ত হিসাবে বুঝতে পেরে সুযোগ-সন্ধানী দূরদৃষ্টি নিয়ে এ্যাংলো-বেঙ্গলী বিদ্যালয় অথবা ইংরাজী বিদ্যালয়ে দিকে দ্রুত ছুটে গেল তারা। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মী কারণে মুসলিম উচ্চবর্গ পিছিয়ে পড়লো, পরবর্তী কালে যা পরিণাম হলো সুদূরপ্রসারী।

সাধারণ পাঠশালায় মুসলমান ছাত্ররা হিন্দুদের সঙ্গে পড়তো, এবং শিক্ষকদের একটা অংশ যে মুসলমান ছিলেন তা আমরা

ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল পুরোপুরি ইসলামিক ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্র। মক্তব ছিল সাধারণ গরীব মুসলমান এবং নব মুসলমানদের জন্য। আবদুর রহিম তাঁর "বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস" (১ম খণ্ড) গ্রন্থে অবশ্য ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনকালে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ছিল। ...মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষা শুরু হত মক্তবে। এসব মক্তব প্রতিটি মসজিদ এবং এমনকি [মুসলমান] ব্যক্তিদের বাড়ী-সংলগ্ন ছিল।" মক্তবে মুসলমান ছেলেদের (প্রমাণাভাবে আমরা মেয়েদের কথা উল্লেখ রেখেছি) শিক্ষা শুরু হতো। আমাদের পূর্ব আলোচনা স্মরণ করলে একথা যথার্থ বলে মনে হবেনা। তাছাড়া বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বীরভূমের মক্তব সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। সমসাময়িক নথিপত্রে, এমনকি জেলার বিস্তৃত প্রতিবেদনেও মক্তবের উল্লেখ নেই। উল্লেখ আছে মাদ্রাসার। আসলে বেশির ভাগ মক্তবই ছিল মুসলিম নীতি ও আচার-আচরণ শিক্ষার বিদ্যালয়। বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং তাদের মাতৃভাষা যে বাংলা ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অথচ কোরান লেখা আরবী হরফে আরবী ভাষায় যা অধিকাংশ মুসলমান পড়তেও পারতো না, বুঝতেও না। এটা সম্ভব, কোরাণের হরফ-ভাষার সঙ্গে তাদের পরিচিত করার জন্য মক্তবে হয়তো কিছুটা আরবী-ফার্সী শিক্ষা দেওয়া হতো, —তার সঙ্গে যৎসামান্য লেখা শেখাবার ব্যবস্থা থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ওই পংগু আরবী-ফার্সী শিখে তারা সঠিক ও স্বচ্ছন্দভাবে কোরাণ পড়তে বুঝতে পারতো এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। লেখার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তা আরও অনেক বেশি সময়, শ্রম ও নিষ্ঠা সাপেক্ষ। সহজ বরং অক্ষর পরিচয়ের পর না বুঝে মুখস্থ করা অর্থাৎ স্মৃতিতে ধরে রাখা যা সাধারণ মানুষ যুগ যুগ ধরে বংশানুক্রমে করে আসছে।

সঠিক ও গভীর ভাবে আরবী-ফার্সী শিখে কোরান পড়া ও বোঝার ব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা আসলে ধর্মশিক্ষার উচ্চ বিদ্যালয়। এখানে সাধারণত আসরফ অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণীর মুসলমান ছাত্ররা পড়তো। পড়াতেন মৌলবী-মৌলানারা। কোরান-হাদিস ও ইসলামের রীতি-নীতি-পদ্ধতি ছিল এঁদের নখ দর্পণে। টুপি পরিহিত, শ্মশ্রুমন্ডিত, ইসলাম-সম্মত পোষাক-আষাক, আদব-কায়দায়, জীবনযাত্রার ধরণধারণে এঁরা নিজেদের আদর্শ মুসলমান হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন। স্থানীয় ধর্মীয় কাঠামোয় এঁদের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। ইসলামের মৌলিক ও পবিত্র রূপটি রক্ষা করার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা প্রহরী বলা যায়। ইসলামের বিস্তার, বাইরের অশুভ প্রভাব-প্রতিরোধ এবং ইসলামের বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় অদম্য উদ্যম এঁদের দৃঢ়তা ও উন্মাদনা। ভারতে ইসলামের ক্ষমতা-চ্যুতির কথা এঁরা কখনো ভুলতে পারেননি। ইংরাজদের অধিকারে ভারত "দার-উল-ইসলাম" থেকে "দার-উল-হার্ব"-এ পরিণত হয়েছে নির্মম এই সত্য তাদের বুকে প্রতিকার ও প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে রাখতো সর্বদা। জেলার ওয়াহাবী ও ফেরাইজী আন্দোলনের ক্ষীণ দীপশিখাটি এঁরা বেশ কিছুকাল নির্বাপিত হতে দেননি। খৃষ্টধর্ম, ইংরাজী শিক্ষা ও আচার-আচরণকে এঁরা প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা তো করতেনই, সমান ঘৃণা করতেন দেশীয় আচার-আচরণ ও ভাষাকে। ফার্সী অথবা উর্দু ছিল এঁদের ঘরে-বাইরের বুলি। মনে প্রাণে, শয়নে-স্বপনে, ধর্মীয় আরবী-ফার্সীর চর্চা করতে করতে এঁরা যেন খেজুর-ক্যাকটাসের ইতস্তত বিস্তার ও উট-বাহিত মন্থর কাফেলার পরিমণ্ডলে ঊষর আরব মুলুকের মানস-বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে দেশের জলসিক্ত সজীব মাটির সঙ্গেও সংযোগ হারিয়ে ফেলছিলেন ক্রমশ। একই সঙ্গে ধর্মান্ধতা, দেশীয় বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্নতা, মানসিক কূর্মবৃত্তি, বিধর্মীদের প্রতি জেহাদী মনোভাব শ্রেণী হিসাবে এক সংরক্ষণধর্মী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত করলো তাঁদের। তাঁদের প্রভাবে পশ্চাদপদতার শিকার হল সমগ্র মুসলমান সমাজ। (এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত হবে, ক্ষমতার উত্তুঙ্গ শিখরে আসীন থেকে, এমনকি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধঃপতনের মধ্যেও, রাজনগরের শিয়া গোষ্ঠীর পাঠান মুসলমানরা ধর্মের দিক থেকে ছিলেন অত্যন্ত উদার। হিন্দুরা তাঁদের অধীনে বহু উচ্চপদ অধিকার করেছিল, হিন্দু সাধু সন্তের ভরণ-পোষণে, মন্দির স্থাপনে, মুসলিম পীর-ফকীরদের সেবায় মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদানে এঁরা কোন বাছ বিচার করেননি। রাজনগরে একটি বৃহৎ মাদ্রাসাও ছিল) এইভাবে তৈরী হলো সুবিধাভোগী হিন্দু উচ্চ বর্ণের সঙ্গে মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর বৈষম্য-জনিত ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও বিচ্ছেদের এক দুর্লংঘ্য বাতাবরণ। ব্রিটিশ নীতি ইচ্ছাকৃতভাবে একে আরো সুদৃঢ় করেছিল সত্য, কিন্তু তাই বলে পরিস্থিতি সৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পুষ্ট হিন্দু উচ্চ বর্গ এবং তাদের সহযোগী হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিতদের অবদানকে খাটো করে দেখা ইতিহাস-সম্মত হবেনা। মুসলিম শুদ্ধিকরণ নীতির পাল্টা শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ। উনিশ শতকের শেষার্ধের শুরুতে সৈয়দ আহ্মেদের আর্বিভাবের আগে সমাজের অভ্যন্তর থেকে মোল্লা-মৌলবী প্রভাবিত মুসলিম সমাজে পশ্চাদপদতার ঘোর কাটাতেও তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা হয়নি। কিন্তু সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। এখানে সে আলোচনার অবকাশ নেই।

[একটা দীর্ঘ প্রবন্ধের দুটি অধ্যায় মাত্র এখানে ছাপা হলো। বাকি রইলো আরো দুটি অধ্যায়— শিক্ষাক্ষেত্রে খৃষ্টান মিশনারী ও ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ধারা।]

পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদনের আশঙ্কায় মূল রচনায় বিস্তৃত সূত্র-নির্দেশ করা হয়নি। অপ্রকাশিত কিছু সরকারী উপাদান ছাড়া যেসব প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো হলো :

১) Perival Sphear, India

২) A.R. Desai, Social Background of Indian Nationalism (Bombay, 1996)

৩) Anathnath Bose, ed. Reports on The State of Education in Bengal. (1835 and 1838) by William Adam (Calcutta, 1941)

৪) A Mitra, District Handbooks: Birbhum (Calcutta, 1954)

৫) পরমেশ আচার্য, বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৮৯)

৬) J.M. Sen, History of Elementary Education in India (Calcutta, 1941)

৭) পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পৃ (বিশ্বভারতী, ১৯৬৮), ২য় খণ্ড (বিশ্বভারতী)

৮) পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি পরিচয়, প্রথম খণ্ড (বিশ্বভার ১৩৫৮), দ্বিতীয়খণ্ড (বিশ্বভারতী ১৯৫৮)

৯) রঞ্জন গুপ্ত সম্পাদিত, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলে রজতজয়ন্তী পত্রিকায় প্রকাশিত, পঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধ 'প পত্রে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থা' (সিউড়ী, ১৯৭০)

১১) N.K Basak, History of Vernacular Educati in Bengal (Calcutta, 1974)

১২) মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃ ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (ঢাকা) □

সংস্কৃতির বিজ্ঞান ও আমাদের মূল্যবোধ

ড. অসিত দত্ত

সংস্কৃতি বলতে একটা ব্যাপকতার বিষয় এসে পড়ে। কোন নির্দিষ্ট ভাবনার ব্যূহে একে ধরা যাবে না। "It designates man-made artifacts activities People Perform, and ideas and feelings' সংস্কৃতির পরিচয় জীবনের সামগ্রিকতার মধ্যে বিধৃত থাকে। জীবনের চলার প্রকৃতির মধ্যে, ছন্দের মধ্যে, ভাবনা ও আদর্শের মধ্যে সংস্কৃতির রূপ ও প্রতিভাত, তা জীবনকে উপলব্ধি করার মধ্যে, তার আদর্শকে, মূল্যবোধকে অনুভব করার মধ্যে স্পষ্ট হয়। জীবন মানে যদি সামগ্রিকতা হয়, তাহলে তার সংস্কৃতি এ সামগ্রিকতাকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত। এ প্রসঙ্গে এটাও বিবেচ্য যে, সংস্কৃতি কখনই আপনাতে আপনি বিকশি'র তত্ত্বে প্রযুক্ত নয়। কারণ, সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট জীবন কাঠামো থেকে রসদ সংগ্রহ করে। তার শিকড় জীবনের ভিতে প্রোথিত থাকে। বাংলা সাহিত্যের আদি পর্বের মধ্যে যে জীবনকাহিনী আছে, তাই তৎকালীন সাহিত্য সৃষ্ট জীবনচিত্র ও তার সংস্কৃতি। যেমন,

"মেহলি চণ্ডালী ঘরবি ব্রাহ্মণ
কণ্হা বিটালন্তি তে দুই লাম্বন।
হল সহি কামঞ্চি অচাভুঅ দিট্ঠা
বলণ মনুস চণ্ডালিএঁ তুট্ঠা।"

অর্থ হল — "মহিলা (অর্থাৎ গৃহিনী) চণ্ডাল নারী। গৃহপতি ব্রাহ্মণ। তাহারা দুইজন (পরস্পর) অবলম্বন করিয়া জগৎ অপবিত্র করিতেছে।

ওগো সই, কি অতি-অদ্ভুত (ব্যাপার) দেখিলাম।"

এ জীবনচর্যার মধ্যে একটি সমাজজীবনের ছবি আছে। একটি সংস্কৃতির পরিচয় বিধৃত আছে। আবার, একে অবলম্বন করে আমরা তার ভিত্তিভূমির পরিচয় পাই। এ সামাজিক জীবনের ছবি চিরকালীন নয়। একটি সামাজিক কাঠামোয় এক একটি সামাজিক বোধের উন্মেষ ঘটে, তার রূপ আলাদা, তার চরিত্র আলাদা, তার রঙ-রস, সৌন্দর্য্য পৃথক, ভিন্নতর। সুতরাং একটা বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট যে, জীবনের বিচিত্র-বিভিন্ন পথে চলার তার সামগ্রিক রূপ-বিন্যাসের অপর নাম সংস্কৃতি। চলার পথে বাঁক-উপবাঁকে যে অভিজ্ঞতার আবির্ভাব ঘটে, এবং আবার তার উপর ভবিষ্যৎ জীবনটা নির্ভরশীল হয়, তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দিষ্ট হয় এবং বিবর্তন লাভ করে। তার মধ্যে তার সাংস্কৃতিক রূপটি বিন্যস্ত হয়। তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সংস্কৃতিটা কোন নির্দিষ্ট মাপের নির্দিষ্ট আঙ্গিকের ছক বাঁধা নিরিখে নিয়ন্ত্রিত হয় না। জীবন যেমন অব্যাহত গতিধারা, তার সীমা আছে, অসীম বিস্তৃতি আছে, ঠিক তেমনি তার সংস্কৃতির জগত। মধ্যযুগের সংস্কৃতি কখনও দাসযুগের সংস্কৃতির সঙ্গে এক নয়, কারণ, দাসযুগের সামাজিক বিন্যাস মধ্যযুগীয় আদলে, আদর্শে গঠিত হয় নি।

সংস্কৃতির আদিম উৎস স্থল —

আদিম যুগ থেকেই মানুষ প্রকৃতিকে তার আশ্রয়স্থল বলে জেনেছে। স্বভাবতঃই প্রকৃতিসৃষ্ট উদ্ভিদের সঙ্গে তার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। উদ্ভিদ যুগিয়েছে আহার, আবরণ ও আশ্রয়। দিয়েছে বংশবৃদ্ধির প্রেরণা। মানুষ স্বনির্ভরতার পথে অগ্রসর হলেও তার আত্মিক যোগকে সে বিচ্ছিন্ন করে নি। আমাদের বাঙলার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে বিচিত্র সব উদ্ভিদ-ফল-ফলের উপস্থিতি তার সাক্ষর বহন করে। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে বট, অশ্বত্থ বৃক্ষদেবতারূপে এবং সিজ বা মনসা গাছ সর্প দেবতা মনসার প্রতীক রূপে পূজিত হয়ে থাকে। শেওড়া গাছ অপদেবতার অবস্থান রূপে চিহ্নিত। আম বারুণীতে জোড়া কাঁচা আম গঙ্গায় উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত। পূজার ঘটে আম্রপল্লব বা আমসরৎ অপরিহার্য্য। বিবাহ অনুষ্ঠানে আমপাতার বেষ্টনী রচনা রীতিরূপে গণ্য। 'শনির লুঠ' কাঁঠাল পাতাতেই দেওয়ার রেওয়াজ। দুর্গাপূজার কলা বৌ (নব সংখ্যক উদ্ভিদের সমষ্টি — কদলী, হরিদ্রা, ধান্য, কচু, মনি জয়ন্তী, দাড়িম্ব, অশোক ও বিল্ব) শস্যদেবী রূপে এবং কোনো কোনো অঞ্চলে লক্ষ্মীর প্রতীকরূপে পূজিত হয়ে থাকে। বিয়ে বা সন্তান কামনায় কৃত বিভিন্ন লোকাচারে কাঁচা হলুদের বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়। বাঙলার লোকসংস্কৃতির উপকরণের মধ্যে এ সমস্ত উদ্ভিদ ফুল-ফলের অবস্থিতির মধ্য দিয়ে যেমন এ সমস্ত উদ্ভিদের প্রাচীনত্ব নির্দেশিত, তেমনি উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রজনন সম্পর্কিত প্রাচীন লোকবিশ্বাস ও শস্য কামনার আকাঙ্ক্ষাও অভিব্যক্ত।

এটা একটা স্তর বিন্যাসের ছবি হিসেবে চিহ্নিত। আজ মানুষ অভিজ্ঞতার স্তর বেয়ে ভিন্নতর অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে, জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আজকের সমস্যাদীর্ণ, আবার সম্ভাবনাপূর্ণ জায়গায় এসে পৌঁছেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের আদর্শ, মান, মূল্যবোধ পাল্টেছে এবং তার জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্কৃতির ভিন্নতররূপ পরিগ্রহ করেছে। একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে জীবনায়নের যে সমস্যা আমাদের, সমাজ বিন্যাস যে রূপের যে আদর্শের যে মৌল চরিত্রকে বহন করে চলেছে, তার সংস্কৃতি ভিন্ন মাত্রার হতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এ সামাজিক কাঠামোয় ভিন্ন আদর্শের ধারা বহমান,

ভিন্ন মাত্রার আদর্শবোধ বিরদমান রূপ নিয়ে অবস্থান করছে, সেখানে সংস্কৃতির জগৎকে অবিকৃত রাখার একটা প্রচেষ্টা, একটা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। গ্রাম বাঙলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিপর্যস্ত করার পরিকল্পিত প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য ভিন্ন শক্তি, ভিন্ন বৈজ্ঞানিক আদর্শ নিয়ে হাজির থাকবে। সমাজের দ্বন্দ্বের মৌলিক রূপ এটা। সুতরাং জীবন প্রবাহ যেমন দ্বিধাবিভক্ত সংস্কৃতির প্রবহমানতা ভিন্ন মাত্রাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং এ দুই মাত্রার রূপ আমরা সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপের মধ্যে তার চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য করছি। গ্রাম বাঙলার লোক সংস্কৃতির রূপ যার মধ্যে এখনও ধরা আছে, যেমন আমাদের বাউল, ভাদু, টুসু, ঝুমুর, লেটো, কবিগান, কীর্তন, তার জায়গায় পুঁজি নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতিকে ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে, দেহসর্বস্বতাকে সংস্কৃতি বলে গ্রহণ করানোর আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। আমাদের ঐতিহ্যের উপর, আমাদের জীবনের আদর্শের উপর চরম আঘাত হানার একটা সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের ফলে এটা ঘটছে। পৃথিবী আজ অনাবিষ্কৃত, অপরিচিত, সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন জায়গায় নেই। সুতরাং পুঁজিবিস্তারের নব নব কায়দায় দেশের মূল ভিত্তিকে যেমন বিধ্বস্ত করার চক্রান্ত করছে, ঠিক তেমনি সমাজের যে উদ্ভাসিত রূপ— তার সংস্কৃতি যাকে অবলম্বন করে আপামর জনসাধারণ বেঁচে থাকে, বাঁচার মানে খুঁজে পায়, তাকে মূল্যবোধের শূন্যতায় পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে। অবক্ষয়ী সংস্কৃতিকে, পুঁজি বিস্তারের সহায়ক সংস্কৃতিকে দেশের সংস্কৃতি বলে চালানোর পরিকল্পিত প্রচেষ্টা করছে। তার প্রধানতম মাধ্যম দূরদর্শনের বিজ্ঞানাশ্রিত প্রচার কৌশল। সমাজের মৌলভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই এ সংস্কৃতির জোয়ার তৈরী করার চেষ্টা চলে। যে দেশে পুঁজির দাপট নেই, যে দেশ বিদেশী শক্তির সম্প্রসারণের কাছে মাথা অবনত করে নি তার সংস্কৃতি জনমানসের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সমাজের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান সংস্কৃতি আদর্শ সমকালীন মানুষের আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত, এবং এ কাঠামো ও উপরিকাঠামো-সৃষ্ট সংস্কৃতির প্রবাহ আমাদের মূল্যবোধের স্রষ্টা। জীবন যেমন চলে, বিকশিত হয়, বিবর্তিত হয়, সংস্কৃতিও ঠিক অনুরূপভাবে সার্বিক বিস্তারে জীবনের আদর্শকে, মূল্যবোধকে, সমাজবোধকে জীবনের সার্বিক অর্থকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এখানেই সংস্কৃতির বিশালমাপের আদর্শ ও মূল্যবোধ।

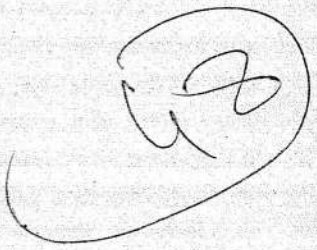

সূত্র— (১) Understanding culture. John. J. Honigmann.
(২) বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস-১ম সুকুমার সেন
(৩) বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। সম্পাদনা ড: বরুণ চক্রবর্তী।

In Memoriam

Debabrata Chatterjee
Sometime Lecturer in
English, K. C. College

It goes without saying that centenary celebration is an important milestone in the life of institution. Krishna Chandra College, Hetampur enjoys such a rare occasion to celebrate its birth anniversary. This Premier academic institution, tucked in a remote sleepy village of ...m, was established in the year 1897 and it had produced in the past a good number of ...rs who shone in life in various fields of activity.

I seize upon this rare occasion to ventilate my experiences as an ex-teacher of English ... than two decades back. Since then much water has flowed down the river "Sal". Many ...es have been made. I also left the college with a regret for not having Hons. teaching ... and joined West Bengal Education Service as a lecturer in English in Durgapur Govt. ...ge. I can not but remember those sweet salad days of my professional life at Hetampur ...na Chandra College. It was a short period of only three years from January, 1973 to Janu-...976. Then I was a young, energetic youth of thirty. There was a good reciprocity between ...achers and the taught. I very well remember those dark cavernous class rooms of the ...ge. There were hardly 'off' days; we used to go to the college daily. We, a number of teach-...m Suri, used to go to Hetampur by bus. We did not worry about seats as they must be ...d by the college students who were our co - passengers in the same bus. Oh, what a bliss ... for a student to offer a seat to his teacher in a running over-croweded bus . There was no ...g haggling with the 'polite' bus conductor for a concession in bus fare. It was a short, ...t journey by bus for half an hour. Not only were the classes regularly and sincerely taken, ...o was the students' direct participation felt in class room discussion. In the shortage of ...ooks, I remember very well, I cyclostyled the prescribed pieces outside the college and ...uted among the students. Those were the haleyon days when an amiable relation pre-...d between the teachers and the pupils. After taking classes almost daily we used to go to the ...ssors' Mess, housed in two mud-build cottages. We would spend there some time in gos-...g and tea-taking, discussing every thing from kings to cabbages. Just before dusk we used ...m home carefree.

Some twenty years back the sweet relation did not degenerate into a commercial con-...oved the students very much, they also did not regard me less. That sweet attachment is ...es revived whenever I meet some of my old students of Hetampur. On seeing me they ...o emotional exuberance, addressing in the same old condescending tone, with bowed ...th that much endearing word 'Sir'. In most cases their names slip from my leaking ... Whenever I meet them either on a railway platform or in an over-crowded bus or even

in a hospital, my joys know no bounds. A few days back I had been to a local nursi
see a patient of my acqunaintance; there I came across an old Hetampur students o
became so much over-joyed to see his old teacher that he sprang up instantaneously
for getting the fact that he was a surgical patient on bed.

Twenty years back things were quite different. The present system of private
not flourish so rampantly. Teachers did not know them the Aladdin's magic lamp
easy money. Not unmindful of their professional obligation, they hardly run after a q
Teaching was not a profession then, but a vocation. I am proud of the glorious p
institution. Some fifty years back there was a D. Litt in English in K. C. College -
thinkable even in a University today. I shall fail in my sense of gratitude if I do not me
names of some dedicated teachers of the past - such as the late L. Mukherjee, the late Ja
Sanyal. the late Promod Bandhu Sengupta, Sree Gopal Govinda Mazumder, Sree S
Mohen Chatterjee, Sree Mahadeb Chatterjee, Sree Krishna Nath Mallick etc. They
celebrated professors to whom pedagogy was not petty fogging, but a sincere dedicatio
out these teachers of the past, Krishna Chandra College is a shadow of its former maje
The neighbouring Colleges of today like Bolpur, Suri, Labpur, Sainthia and Rampurhat
the grand children to this revered, old grand father. In the days of yore it was a status sy
read at Hetampur. Then only the rich could afford higher education and young member
elite class used to read there. The famous 'Mansayar' hostel bears testimony to many fo
sagas of the past when college education was not only costly but a luxary too. Amo
illustrious students of the past the names of Dr. Srikumar Banerjee and Dr. Rama
Mukherjee may be cited. How many colleges of West Bengal can claim such a g
record !

On the occasion of the completion of 100 years of its existence, I wish that K
Chandra College should follow its long tradition through its association with eminent aca
cians. The college had rendered commendable survices towards dissemination of colle
education to the students of this backward part of Bengal. I hope this famous seat of lea
will be true to its tradition in the coming years.

□

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্মৃতিচারণ

সুস্মিতা বিশ্বাস

(বিধায়ক, প্রাক্তন ছাত্রী)

আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে আমার স্মৃতির আলোকে ছাত্রী-জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাঁরই অনুরোধক্রমে আমি আমার ছাত্রী-জীবনের কিছু স্মৃতিকথা লিখে জানাচ্ছি।

মানবজীবন বহুবিচিত্র ঘটনার তরঙ্গের অভিঘাতে আন্দোলিত। সবকিছুকে আমরা স্মরণে রাখিনা। কিন্তু অতীত দিনের এমন অনেক ঘটনা প্রবাহ স্মৃতিলোকে বিচরণ করে যা আমাদের জাগ্রত চেতনাকে বার বার ধাক্কা দেয়।

স্মৃতি রোমান্থনকালে প্রথমেই আমায় বলতে হয় হেতমপুর রাজপরিবারের শিক্ষা প্রসারের ঐকান্তিক সদিচ্ছা না থাকলে হেতমপুরের মতো অখ্যাত পল্লীগ্রামে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। আজ থেকে ঠিক ১০০ বৎসর আগে ১৩০২ বঙ্গাব্দে রাজসী রমনী রাজা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্মিনী রাণী পদ্মাসুন্দরী দেবী কর্তৃক এই মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা হতে বহুদূরে সেই ইংরাজ আমলে, সেকলে সাহেবের যুগে এরূপ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সত্যই অভাবনীয়। শোনা যায়, সে যুগে "ফেনী কলেজ" ছাড়া আর কোনো কলেজ অখণ্ড বাংলাদেশে ছিল না।

আমি গ্রামের মেয়ে। হেতমপুর আমার জন্মস্থান, শৈশব থেকেই আমি আমার গ্রামে কলেজের সঙ্গে পরিচিত। নিবিড়তম পরিচয় সূত্রে আমি আমার অতি প্রিয় কলেজটির সঙ্গে শতপাকে জড়িয়েছিলাম। আমি এই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করি। তারপর থেকে সুদীর্ঘ ১০।১২ বৎসর কলেজ জীবন পরিত্যাগ করে এসেছি। আমার জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমার জীবনে অনেক উত্থান-পতন ঘটে গেছে। বর্তমানে আমি রাজনীতি করি। এখন আমার অনেক ব্যস্ততা বেড়েছে। তবুও শত কাজের মধ্যে আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক অধুনা সুদক্ষ অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত যার পরনে ধুতি পাঞ্জাবী, প্রসন্ন মুখ, সৌম্যমূর্ত্তি। তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন—ছাত্রদলই কলেজের গৌরব, দেশের গৌরব। সেদিনকার সেই উপদেশ আজ আমি প্রাণপণে রক্ষণ করে চলেছি। আমাদের সময়ে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন গোপাল গোবিন্দ মজুমদার মহাশয়। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্রদিগকে কেমিষ্ট্রি পড়াতেন। তিনি আমাদের সকলকে পূর্ণ মনুষত্ব অর্জন করবার উপদেশ দিতেন, এছাড়া আমাদের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক কিশোরীরঞ্জন দাস মহাশয়ের পঠন-পাঠন ছিল অপূর্ব। তাঁর বক্তৃতাকে আমার মনে হত ঝর্ণার অনিরুদ্ধ স্রোতোধারা। ভাষা যেমনি গতিশীল তেমনি তরঙ্গায়িত ও সংগীতমুখর। আমাদের দর্শন বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক জগদীশ্বর সান্ন্যাল ও প্রমোদ বন্ধু সেনগুপ্তের নাম পশ্চিমবঙ্গে কলেজে কলেজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যিই তাঁরা ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, এছাড়া বাংলা বিভাগের K.M. নিমাই প্রামানিক, জগৎবন্ধু মেদ্দা মহাশয়ের পঠন পাঠনের চমৎকারিত্ব এবং ছাত্রদরদী মনোভাব সত্যই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহারে আমার বক্তব্য হোল আমি বিশ্বাস করি, আমাদের মহাবিদ্যালয়ে প্রাচীন বট বৃক্ষের মত বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত করে, সুদীর্ঘকাল ধরে শিক্ষার ধারক ও বাহক রূপে চির অম্লান থাকবে।

পরিশেষে, নারী শিক্ষা সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলার আছে। আজকের দিনে আমাদের শিক্ষার বিলাস ত্যাগ করে পরিপূর্ণ রূপে বাঁচাতে হবে। এবং সেই বাঁচার জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার উপযুক্ত পথটি প্রসারিত করা। শিক্ষা পদ্ধতিতে নারী জাতির আত্মবিকাশের পথটি খুঁজে বের করতে হবে। কারণ আলেয়া আলো নয়। □

57

"Hydrogen as an alternative source of energy"

Dr. Pranabananda Mandal
Lecturer in Physics

The fast depletion and eventual exhaustion of fossil fuels have made it imperative for scientists and technologists to search for alternative energy sources. Hydrogen as secondary energy source holds great promise in the years to come .One of the advantages of hydrogen is that it can be produced from the abundantly available raw material water --- through several forms of input energies .Of particular importance is the production of hydrogen from water using solar energy .For successful harnessing of hydrogen energy , an efficient,economical and safe storage system is required to be developed. Metal / alloy hydrides which store hydrogen at densities higher than liquid or solid hydrogen represent the most potentially attractive hydrogen energy storage system.

As regards utilisation, hydrogen has manifold applications, namely , it can be used as a household Cooking gas , for space heating and industrial purposes etc. However, the most important near term application of hydrogen corresponds to its use as a fuel in different engines. It is almost a complete substitute for oil ,with better weight-to-power ratio,when used as automotive fuel.

A very important point with hydrogen as fuel corresponds to the fact that it is clean ; on burning it reverts back to water - the material from which it was produced. Because it is pollution free, hydrogen represents a fuel which can be used much before the exhaustion of fossil fuels to avoid acid rains , a potential hazard to agriculture and civilization . This aspect is of special significance for a country like ours where the economy is largely based on agriculture.

In conclusion , it can be said that because of its inexpensive production involving water and solar energy and its elegant storage in the form of solid state storage " Hydrogen" is very potential non-conventional energy option. Since unlike electricity it can be used as a fuel and since fuel corresponds to a major energy need, "Hydrogen" is bound to enter in a big way as a possible energy option and a substitute for the oil / petroleum which is a polluting fuel and is getting depleted and will eventually become non-existent.

□

হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের শতবর্ষে

॥ গান ॥

কথা ঃ- আশানন্দন চট্টরাজ (প্রাক্তন ছাত্র)

(এসো) হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র
কলেজ সোপান-তলে
হের সবে আজ শতবরষের
শত দীপ সেথা জ্বলে।
সে আলো ধারায় করিবারে স্নান
এসো জ্ঞানী, গুণী ওগো বিদ্বান
প্রাক্তন সাথে হে বর্ত্তমান
মিল এসে দলে দলে।
(এসো) হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র
কলেজ সোপান-তলে।।

পুণ্যশ্লোকা মহারানী মাতা
"পদ্মসুন্দরীর"
মন-পটে আঁকা ছিল যে একদা
এই বাণীমন্দির।
বঙ্গাব্দের তেরশত তিন সনে
পেল রূপ তাহা, ছিল যা তাঁর স্বপনে
(হের) সে বাণীপীঠ আজ সজ্জিত -
শত বরষের শতদলে।
(এসো) হেতমপুরের কৃষ্ণচন্দ্র
কলেজ সোপান-তলে।।

প্রপিতামহকে

মহঃ ঈশা

সেই প্রপিতামহকে,
আজ প্রণাম জানাই।
যার শুভ্র কেশদাম
পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতীক,
শতবর্ষের লোলচর্মে
জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার
বলিষ্ঠ বলিরেখা।
ঋদ্ধ সেই জ্ঞানালোক
প্রদীপের শিখায় শিখায়
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আজ
বিশ্বালোকে রূপান্তরিত।
তারই স্নেহ ছায়ায়
ক্রমাগত বেড়ে ওঠা
আলোক বর্তিকা সংখ্যা -
বিশ্বমানবতার এক
বিপুল অংশের দাবিদার।
জ্ঞানের আলোয় যারা
উদ্ভাসিত করে তুলেছে -
মুক্তির বিশাল অঙ্গন।
আশ্বিনের মাঠে ঘাটে
মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা
শরতের কাশ ফুল।
অভাবের শারদীয় উৎসবে
বিসর্জনের বাজনাকে ম্লান করে
কাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ বয়ে আনে,
সোনালী ধানের স্বপ্ন দেখায়
কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা।

পরিশিষ্ট
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

REMINISCENCES OF HETAMPUR

Dr. Srikumar Banerjee, M. A. PH. D.
[Retired Ramtanu Lahiri Professor of Bengali, Calcutta University.]

It is just fifty years from today that I bade farewell to Hetampur on the comp of my F. A. course, leaving for the Examination centre at Burdwan. I joined Het College two years ago in 1906 and spent two of the happiest years of my period adolescence there. Stretching my vision back across the gulf of a half century, how o distant past looks ! Life seems a strange amalgam of facts and fiction, of memori imaginings, of hard, indisputable events and a gloss of tender yearnings of sunshi mist and a halo of the unreal rests upon the landscape retrospectively recovered. times I doubt my own experiences and feel uncertain whether they happened to me callow fledgling that somehow appropriated my name and masqueraded in a bor identity. How much of what I am today was discernible in that remote, undeveloped mine, in which new ideas had begun to germinate, new contacts with life realeased of which I was but dimly aware, new features began to show themselves with a disco ing confusion and my other ego was like a young sapling swayed and humbled by t tossing breezes of spring, - is a matter of uncertain speculation, a truth to be guessed firmly entertained.

But leaving aside this very natural tenderness to day-dreaming, let me try to myself on solid ground. One day in July of 1906 I found myself, a boy still on the thr of my teens, in the enchanted grounds of Hetampur. The wooded fringe in which t lage nestled gave to a sylvan charm, a picturesque beauty all its own. If the truth m told, the first acquaintance resulted in a Yarrow-Visited not of disillusionment and d sion of spirit. Hetampur, which had sounded big gongs in my imagination ever sin going to it was settled, subsided into a gentle, though musical tinkle, when I actually That the Hetampur Rajbati and the Hetampur College could be housed in such a sleepy village seemed an unsolved riddle to my immature apprehension.

But before long these doubts and questionings resolved themselves into lov ceptance of the real. My maternal uncle, the late Ashutosh Roychoudhury being the master of the collegiate school, I had my seat in the school Boarding house at the ou of the village instead of the distantly situated Mansayar college Hostel. My first college we like introduction into a new world to which I took some time to adjust m The late Radhikamohan Choudhury was our principal and his sweet and charming disarmed our fears and endeared him to his students. Never was the rod of authority more loving and indulgent hands. We do not remember to have ever received any word or reprimand from him and his gentle personality radiated the warmth of l round the college atmosphere. He used to teach us Mathematics, Physics and Che although physics was his principal subject. Those were the days of multiple endow

d responsibilities and the narrow intensity of specialisation had not yet cost its rigorous d exacting discipline on academic life.

There was one professor in charge of the Arts subjects, English, History and Logic d the incumbent of this post kept on changing with rather disconcerting rapidity. The rst was Sri Gurudas Sarkar, happily still alive, who in a few months left us to join the xecutive Service as a Subordinate Deputy Magistrate and who has later established a ecure position for himself in the world of scholarship by his original contributions in the ealms of History and Fine Arts. During his short stay with us he impressed us with his nthusiasm and his serious application to duty. He was specially kind to me, did much to ncourage me and draw out my latent aptitudes.The young minds which he sought to guide lt very keenly the pangs of separation when he left them for a more responsible sphere of ork.

His successor, if I remember the sequence aright, was the late Jogendranath Mitra, ho subsequently became Principal of Uttarpara College and was a noted philosopher. He d an accident while travelling in the newly opened Ondal-Sainthia branch line and left us the eve of the Summer vacation. Later in life, I met him very frequently in Calcutta. He s always affectionate to me, and though he had lost his sight, he showed himself a true ilosopher by the uncomplaining firmness and the unruffled sweetness of temper with ich he bore his affliction. He was a deeply religious man, securely anchored on his faith God and patiently resigned to His will through all changes of fortune. Under him our te in Logic was securely established and its rough ways made plain to our understanding. e was a musician of talent, but too shy ever to be pursuaded to give a demonstration.

The last of the trio was Sri Atul Chandra Sen who stayed us out of our term. I met in Calcutta while he was engaged in bringing out an edition of the Upanishads. He was erudite scholar and a man who realised the ideal of plain living and high thinking. But stay with us was of too short a duration to admit of his making any lasting impression on

But the most charming personality in the college staff was our Sanskrit teacher, the Ambicacharan Roy Choudhury. He was distantly related to me as a maternal uncle and m the first day showered his love on me in a superabundant measure. He was domiciled Hetampur for a long time and was on intimately familiar terms with the members of the family. He was a man of sparkling wit and humour and his classes were an inexhaust- foundation of joy and entertainment for us. For every student in the class, he had a rtee and anecdote ready at the tips of his tongue, which fitted his special case as exactly he glove fits the hand. At the same time, he was a profound scholar and a highly suc- ful teacher equally at home in bringing out the beauties of Sanskrit literature and ex- ding the intricacies of Sanskrit grammar. It was under his able teaching and inspiring dance that I quickly made up my deficiencies in Sanskrit and acquired a taste for it ch I retain even today. He bubbled over with merriment and joy and his rotundity of portions, unfailing humour and keen, unblunted zest in life imparted to his personality a h of Falstaffian greatness. Never shall I forget the witty anecdote, made a trifle pungent e application, with which he wheedled out of Raja Ramranjan his arrears of salary. The

55

Raja gave him his dues but cautioned him not to reveal the story to his other collea had such a touching confidence in my integrity and thorough dependableness, tha all academic canons and precedents, he discussed with me, a first year student, t tions he was going to set in the Test Examination of my seniors in the Second year virtually set the paper not only with my full knowledge but almost with my active ration. I am thankful to God that the secrert never leaked out and that my revered had no reason to repent of his confidence.

II

But the most interesting experience during the period was the forming of ne ships in the relations with one's fellow-students. School friendships are on the whol and evanescent things, not likely to withstand the wear and tear of life. After knowledge is the basis for all lasting ties and attachments and during our school p hardly know ourselves, our personalities being a loose and shifting aggregate of ep whims and impulses and overcharged, ebullient sentiments not yet fitted to the steady of life. It therefore very frequently happens that the friendships of our school day gerated and often hysterical, spend themselves like a sudden tropical storm, lea permanent trace behind College friendships, on the contrary, based on a mature standing and riper self-knowledge, are more durable and contribute not a little to folding and fixation of personality. In my own case, my contacts with college a Hetampur gave me the first glimpse of the wider world and made me aware or t plexity and many sidedness of life. The greater freedom of college life, the feeling period of tutelage is over, that no peering eyes constantly scan and regulate all thi and that we are thrown on our own initiative for making or marring our career, thi doubt, liable to abuse, has a great sobering sense of responsibility. Some youngme doubt swept off their feet as the wine of new-found freedom mounts to their h works in their blood : but for the majority, at least in our days, steadiness reasserted the long run. Moreover examinations were there looming large in the horizon as a reminder that life is not all a holiday. I came to Hetampur a boy sheltered in the by life ; I felt it as a youth ready to go out on its highways and meet all its surpri reasonable self-confidence, with my faculties strung up to meet the challenge of l

At Hetampur I formed life-long friendships which survive even today. M legible on memory's page, even though I have not met them since I left the place. one name that stands out amidst a crowd, - the name of Ramram Bhattacharya wh us in the Second year as a plucked student and soon made himself the universal Never did I see a more startling and wonderful transformation of the hostel life a sphere in course of a single day than what took place on the advent of Ramda'. I hostel in the morning for college, as a quiet studious place in which the orderly d of life prevailed.I returned to it in the afternoon to find it a place of riotous, i mirth, where a musical party was in full swing and Kavi songs to the accompan rude drums were recited, with the entire body of the hostellers lending there voic the chorus and the shuffle of feet keeping time with the song heralded the outb

Bacchic dance-frenzy. All this metamorphosis was due to the influence of a single man. Ramda' had composed a song recording his first impressions of the college, in which the college clerk was glorified as "the single blear-eyed man in the midst of the blind brotherhood" and the natural beauties of Hetampur with its Sal forest were obliquely referred to in equivocal compliment and he had pursuaded all his hostel mates to join in its singing. It appeared that a college for the teaching of Arts and Science had been changed overnight into a music and dance academy.

Ramda' was a born leader of men, at least of youths. The whole hostel was at his absolute beck and call and every one was eager to offer him willing homage. He was a full-grown man among callow youths and with his tall and towering figure he looked like a patriarch ruling over his clansmen.We listened with wonder and admiration to his many stories of adventure, some of which perhaps might be apocryphal. One of the funniest related to his first encounter with the Principal. He narrated how in coming to Hetampur he travelled from Suri in the same hackney-carriage with the Principal, not knowing him to be such and how they exchanged family gossips and cigarettes, the Principal taking him all the time as a gentleman at large who had perhaps a work to admit in the college. You can very well imagine their mutual surprise and embarrassment when Ramda' presented himself at the college office for admission as a plucked student ! The Principal suddenly changed his tone from deference to curt authority and Ramda' had to look the other way while presenting his cross-list and other credentials for admission. We also recalled with gratitude how Ramda' rescued us from the clutches of a too-obliging and pertinacious sweetmeat-vendor, who thurst his tempting delicacies on our youthful palates till the bills mounted too high and we did not know how to pay him off. Ramda' came to the rescue by contracting a bellyful with him after a full meal, exhausting his whole stock and calling for more which he could not provide. Disgraced for his failure to keep to the terms of the contract he was chased out of the hostel and never dared to show his face there again, much to the relief of our slender purse. At the same time Ramda' had a large and generous heart. When one of the examinees from Hetampur was attacked with cholera at Burdwan during the course of the examination, Ramda' offered to stay at home to nurse him, not taking the examination of that day. Ramda' asserted with great exaltation that no power on earth could make him pass, so it did not matter whether he took the exmination or shirked it. Fortunately, the boy recovered and Ramda' had not to make the sacrifice, although he proved too true a prophet so far as his own chances were concerned.

III

Although the hostel lived a life of its own away from the village, we had occasional and sometimes intimate contacts with the general life of the place. Coming and going from the hostel to college and back we had glimpses of the Ranjan palace with its high and long compound wall and were overawed by its splendour and magnificence which we had but few occasions to see at close quarters. We sometimes saw Raja Ramranjan or one or other of the Rajkumars whirling past us in their fine-looking landaus, and gazed at the swiftly

passing figures as if they were denizens of another world. Some of the younger members of the Raj family we met in football and other sports and came to know them rather intimately. At times we were invited to functions and festivals at the Gouranga temple or the old Raj palace and particularly enjoyed the Saraswati Puja Celebrations which enjoyed a great fame in the neighbourhood and attracted people from far and near. The most outstanding event during our residence was the death of Rani Padma Sundari Devi, which evoked a wide-spread sorrow in the village and cast a shadow of gloom on the whole atmosphere of the place. We watched with awe the elaborate rituals of the Sraddha ceremony, the huge concorse of Pandits and other distinguished guests which crowed the narrow streets of Hetampur, the large processions and Kirtan parties, the huge assemblage of the poor who were sumptuously fed and all the other accessories of an occasion of unusual pomp and sublimity that captured our youthful imagination and lingerd in the memory. The college students were called upon to serve on the occasion, either as volunteers looking to the comforts of the guests or assisting at the distribution of food and in a general way maintaining order, and our services were suitably appreciated by a special feast offered to us. I and a fellow-student composed two poems on the occasion which, as far as I can recollect, were printed and distributed during the ceremony. I may incidentally remark that was the solitary poetic effusion which I had perpetrated in my life.

IV

The two years that we spent at Hetampur was a happy period for all of us, particularly for me. During my entire school life I had been suffering from malaria and had developed into an ill-nourished, underfed boy. It was the salubrious climate of Hetampur that for the first time drove out the germs of malaria in my system and made me fully conscious of the exhilaration of perfect health. In my school days the orthodox doctrine of applying the rod as a preventive to the child's getting spoiled was implicitly belived in and applied with a gusto. Moreover we lived in an atmosphere of perpetual surveillance, where our every movement was rigidly prescribed from above and freedom of choice even in the smallest details strenly interdicted. At Hetampur all this burden was lifted from my life and a freer and more genial atmosphere expanded the sleeping, torpid faculties. It was like the contest between the sun and the wind to make the traveller doff his cloak. This new-born sense of freedom made me feel at home with my surroundings and realise my life not as a chain of inhibitions, but as an unfolding of new graces and aptitudes. I still remember our pleasent rambles through the woods fragrant with the smell of Sal and Mohua flowers, the discovery of quiet, unvisited nooks with an almost Wordsworthian thrill, the occasional tramps to Dubrajpur, and the recently opened Railway Station there, the warm, convivial afternoons and evenings in which youth was free to congregate and expand itself and almost felt the sap of life circulating through the veins and in the blood. It was almost the idyllic life of our youthful dreams, and there was no untoward incident to strike a discordant note in its equable, tranquil harmony.

Hetampur enjoyed the unique distinction of being the site of the only College in the District and its contribution to the cause of higher education in a rather backward area is

worthy of being chronicled in the history of Birbhum. The college is celebrating the completion of the sixtieth year of its existence with a justifiable sense of the pride of achievement. The very fact of its being situated in a rural area away from the distractions of town life added a unique feature to the quality of its training. The young student who is drawn here not only receives the usual kind of tuition in arts and sciences but is initiated, if he has the right receptive temper, into the very mystery of life. An atmosphere of peace and harmony wraps him round and he develops what is a cardinal effet of all our educational ventures - a special way of meeting and dealing with life. The very privations and discomforts he has to face, the simple food, the lack of modern amenities, the plain style of living, the careful economising of resources, intimate personal contact with teachers and fellow students and the rural air which he breaths - all tend to foster a temper and philosophy of life which is of great value in the rapidly dissolving fabric of modern society. The immemorial spirit of Birbhum, with its simple agricultural life, its rooted traditions and hereditary pieties, its deep religious spirit embodied in its many sacred shrines and places of pilgrimage, the **Baul, Vaishnava** and **Sakta** songs sweetening the air and dropping the dews of peace on the world-weary soul seem to linger on in this peaceful village that has kept itself at any rate partially free from the shrill, hysterical discontent, the complicated entanglements of present-day life. Hetampur, like a more far-famed University of the West, appears to breathe the last enchantment of the Middle Ages which in India is not as completely dead as in other parts of the world.

We are on the threshold of far-reaching changes in the educational sphere and rural colleges are expected to play an important role in this impending reconstruction. Our intellectual standards which are too low, our moral standards which have completely broken down and are in urgent need of rehabilitation, our social relations which have lost the cementing bond of a common ideal and in which class distinctions are without their old touch of sweetness and sympathy, our economic life which must be divested of the pure profit motive and endowed with a consciousness of our obligations to society, our administrative system drifting towards a machine-like callousness and impersonality, our religious values which have all but dried up and been reduced to pulp and powder - all these factors of our life which are waiting to be revitalised and suited to the requirements of a fast changing world hinge upon the pivot of an appropriate educational procedure and ideal which we shall have to build up. Hitherto we have not utilised the special opportunities of our educational institutions of the countryside ; we have treated them as but rusty and creaking counterparts of our urban machinery which do not run so well. The passion for centralisation has gone too far to permit of our putting different institutions to their appropriate uses ; instead of taking from them what they can easily offer we have forced upon them a task which they are ill-qualified to fulfill. All this will have to be changed if we are to reap the full harvest out of our educational seed-plots. I wish Hetampur College long years of ever-expanding service to the cause of education & contribution to nation-building through the creation of an efficient human agency. May its influence grow from more to more and may it go on training the future generations of our citizens who will build up the new Bengal of the future and assist her in her onward march to her cherished goal ! [Reprinted from Diamond Jubilee Magazine of the college, April 1958]

My Reminiscences of Hetampur

Prof. L. Mukherjee, M. A.

I

College in a village ! Great was my surprise when I heard it from two young gentlemen who came from Hetampur to see me one fine morning. It was in September 1925 and I was then in Calcutta. They were then unknown to me and so I could not guess what brought them tomy place. I felt a bit surprised and flattered when I came to learn that they were professors and their mission was to recruit me for the college at Hetampur. I had heard of Hetampur before but did not know what the place was like, a town or a village. Imagine my surprise when I was told that a seat of a firstgrade college is a small village with a population numbering a little above 2000. That such a place came to have a college at a time when many of the big towns of Bengal (then undivided) had no facilities for higher education, appeared to be something unique. For a time, I was told of the bracing climate of the place and the cheap cost of living there. I agreed to their proposal and the visitors departed, one of them humorously remarking that I would find Hetampur an ideal place for plain living and high thinking. By the way, let me say that my new visitors were Professor (now Doctor) Biman Bihari Majumder and Professor Shibasaran Choudhuri. Biman Babu had then recently retired from the Hetampur College and I was to fill up the vacancy. He had found "fresh fields and pastures new" at Patna where he added laurels to laurels and eventually became Inspector of Colleges. Shib Babu, whose colleague I was to be, proved to be a valuable friend during the whole course of my long service at Hetampur. These two gentlemen occupy a large niche of my mind when I think of the bygone days of my life at Hetampur.

Some of my friends in Calcutta, when they came to know of my intended departure from their midst, sought to dissuade me. I told them that I had already committed myself and going back upon my word would be unseemly. "A village looks very nice in a picture and village life is a good theme for a poet. But things are not what these artists see through the painted glass of their imagination." This was their sullen remark cynically expressed.I was then in indifferent heatlth and so the prospect of a change to a place reputed to be healtrhy outweighed all other considerations.

It was in the first week of November, 1925, that I left CAlcutta for Hetampur by a night train. I was to get down at Dubrajpur which I reached just at day break. Outside the station gate I secured a hackney carriage and told the coachman to drive to the college hostel at Mansayar where I was to put up for some time. The carriage rattled off along a badly kept rutty road, bumping and jolting, sometimes perilously heeling and compelling me to steady myself with such balancing skill as I had. In about ten minuits I reached the town of Dubrajpur famous as one of the big marts of the district but

abominably filthy and dirty. Dubrajpur passed, the road became broader, the air purer and myself steadire. In another ten minuites I reached my destination where Shibsaran Babu received me with a smiling face. He was then in charge of the hostel and he very kindly gave me a seat in his own room. After refreshing myself for a while I came out to have a look at the locality. There was nothing impressive about the hostel but it is beautifully situated. It stands on one of the main roads flanked on the east by a beautiful forest of Sal trees and on the west by a shady grove of mango tress and the Mansayar pond.On the south runs the main road through the Sal forests on both sides forming a picturesque vista which it will do one's heart good to behold. The hostel looks like a sylvan asram of the good old days, calm and peaceful, presenting an agreeable contrast to the nerve-shattering conditions prevailing in big cities. I found the students of the hostel very obliging and helpful and the unsophisticated mode of their life accorded well with their peaceful surroundings. I stayed at the Mansayar hostel only for a short period and was very happy all the time, thanks to Shib Babu's geniality and the commendable conduct of the students of the hostel.

After a month's stay at the hostel I removed to Hetampur where I brought my family from Calcutta. A suitable house in a village cannot be had for the asking. The college authorities had indeed promised remained unredeemed for a time. So I had to be content for the time being with a miserable-looking cottage which had nothing to recommend it except its proximity to the college. To live in such a house was to me a novel experience and rather than being annoyed I felt somewhat amused. Instead of grumbling I began to work like a day labourer to remove some of the distressing inconveniences calculated to endanger my health and safety. My plain living and hard working evoked both sneer and praise and when the roport of it reached the "Rajas" they were sympathetically stirred. Step by step the needed additions and alterations were made and after some months of patient waiting my house underwent a respectable metamorphoses. Rome was not built in a day and so was my house at Hetampur.

While staying in the Mansayar hostel I had heard of another college hostel situated at a place called Giridanga. As yet I could not make time to go there. Shortly after coming to my new home at Hetampur I started one day for Giridanga. The road leading to it being long and circuitous - about three miles from my place - I took a short-cut route which halved the distance. It took me about forty minuites to reach the hostel where I was greeted by the smiling students and received very kindly by Professor Nikhil Narayan Prachanda who was then in charge of the hostel. A smiple, unostentatious man of amiable disposition Nikhil Babu worked hard for the college and his hostel. Unfortunately he is no longer in the land of the living. A pedestrain journey to Giridanga is rather trying but one will be amply rewarded by the fascinating scenery around it. It is one of the beauty-spots of the locality. The hostel is picturesquely situated on an extensive plot of high ground from which one can have glimpses of the distant hills of Dumka and a refershing panoramic view of the surroundings. Successive Inspectors of Colleges have spoken of it in glowing terms. I used to visit the place whenever I could make timd and with health gradually improving in the salubrious climate of Hetampur, the journey

son of a noble of the Court of Delhi, was appointed by the Fauzdar of Rajnagar to take Charge of Hetampur.

The appearence of Hafez Khan opened a new chapter in the history of Hetampur. The career of his wife, Shernia Bibi, is invested with a halo of romance and conjugal devotion which has made her name a household word at Hetampur. Tradition has it that Sherina bibi was the daughter of emperor Muhammad Shah of Delhi. She and Hafez Khan were brought up together in the royal harem and they were very fond of each other . As they grew up, their mutual attachment that they believed in all sincerity that they believed in all sincerity that Providence had marketd them out for each other.To this doting pair fondly dreaming of their happy union in future the Emperor's announcement that he would give Sherina in marraige to one of his nephews named Hussain, came like a bolt from the blue. Grievous was the news and both Hafez and Sherina were griveously touched at the most tender point of their hearts. Driven to desperation by the intensity of their sorrow they took the bold step of fleeing from Delhi and became for a time homeless wanderers. Eventually they straggled into Hetampur where they found a heaven of refuge. Hafaiz took service under Hetam Khan and soon gave a good acccount of himself. The report of his ability reached the ears of the Fauzder of Rajnagar who, on Hatem's death, gave him the charge of the fort at Hetampur. Fairly established in life, Hafez for a time lived in peace in the company of his beloved Sherina.

But dark times were ahead. The Mughul Empire was tottering to its fall. The intrepid Marathas were coming to the front, throwing out a challenge to the weak and dissolute rulers of Delhi. The great Maratha Chief Raghuji Bhonsle who had already terrorised and devastated the Carnatic, swooped dwon upon Bengal in irriesistible numbers and carried fire and sword everywhere, Bengal was bled white and her people suffered unspeakable miseries. Birbhum in those days was a gateway to Bengal and so had to bear the brunt of the Maratha attack. The Maraths pitched their camp near Suri at a place now known as Kendua wherefrom they sallied out, looting and plundering the neighbouring districts. Hafez Khan of Hetampur strengthened the defences of his fort and set up an arsenal at Krishnanagar which he fortified with ditches and ramparts are still to be found at Krishnanagar.

While Hafez was adding to the fortifications of Hetampur, Hussain, his rival in love, busied himself with plans for the recovery of Sherina. He was greatly piqued by Sherina's escape and began a ceaseless search to secure her. At last he came to Suri and put up at Kendua near the camp of the Marathas. There he came to learn of Sherina's whereabouts and made up his mind to secure her at any cost. Realising that Hafez Khan was no mean enemy he enlisted the support of the Marathas at Kendua by promises of rich rewards and prospects of immense booty to be had by a surprise attack upon Hafez Khan's fort at Hetampur. Looting was the favourite pastime of the Mrathas and so they eagerly responded to Hussion's call. One dark night they stealthily marched out from Kendua along with Hussion and moved towards Hetampur. Hafez Khan who had already got some information of the brewing storm, was well prepared to meet the enemy. As a consequence, instead of surprise attack there followed a fierce fight. Hafez

offered a gallant resistance and was very near success when he was ambushed and stabbed to death by Hussain. His death disheartened his soldires who began lo flee away pell-mell. At this crisis Sherina Bibi rose to the height of the occassion. She took a house and rushing out sword in hand, rallied the soldires and compelled the enemy to retire. But the worst had already happened.She began to weep bitterly over the body of her hasband and with a heavy heart arranged his burial. She then returned to the seclusion of the fort wht a heart broken beyond repair.

Great was Hussion's disappointment at the failure of his enterprise. he however, would not give up his hope. On the contray he felt encouraged by the delusive thought that the death of Hafez had removed the great obstacle which stood between him and Sherina. He sent a speedy messenger to Delhi informing Muhammad Shah of Sherina's wherebouts. The Emperor who was deeply offended at what he considered to be his daughter's unfilial conduct, issued a peremptory order to the Fauzdar of Rajnagar to recover Sherina and send her back to Delhi. Thereupon the Fauzder took the Hetampur fort by a surprise night attack. Sherina was roused from her sleep by the yelling cry of the soldiers who already breached the fort and were well within it. Hussain who was with them, rushed towards Sherina's apartment and tried to seize her. Finding no means of escape the heroic lady cast a look of withering scorn at Hussian and jumped out from the window of her apartment into the pond below. Thus was sacrificed at the altar of love a noble lady whose heroism and single-minded devotion hae become a tradition which still points a moral and adorns a tale. Her little tomb on the bank of the pond into which she took her fatal plunge has become a place of pilgrimage to the local muslims. Even to this day they devotedly put there a burning lamp evey evening.

III

Hetampur has in its neighbourhood many places of interest. I visited some of them with pleasure and profit. Even now when I am far away from them they flash across my mind, blazing a trail of sweet recollections. Kendubilla,popularly known as Joydeva Kenduli, is one of those places. Here in the time of King Lakshman Sen of Bengal was born the saintly poet whose mellifluous lyrical poem, the Gita-Govinda, has immortalised his name. Kendubillwa is about seven miles from Hetampur. It stands on the bnank of the Ajoy river and is an important place of pilgrimage for the Vaishnava sect. Every year a mela (fair) is held here, which begins from the last day of the month of Pous and lasts for four days. The fair is one of the biggest of its kind and attracts people from far and near. It is sight to see continuous streams of pilgrims and shop-keepers plodding their way to attened the mela. Thousands of people bathe in the ajoy which on the occasion of this festival is popularly believed to be invested with the sanctity of the Ganges for three days by a miraculous junction with that sacred river. The days of miracles are not over, science notwithstanding. Another place which greatly fascinated me is Bakreswar, a famous Saiva Shrine. It is about nine miles from Hetampur. The place owes

its name the great sage Astabakra of Pauranic fame who attained seccess here in his quest for spritual enlightenment. It has an atmosphere of solemn serenity which is at once refreshing and impressive. The most noteworthy feature of the place is a group of eight hot springs the like of which is not to be found anywhere in India. They are constanly bubbling with hot water emitting sulphurous vapour. The temperatuer of the springs is not uniform. It varies from spring to spring, and that of one exceeds the boiling point. But the most astonishing thing that strikes a visitor is the existence of a spring of cold water very close to the hot ones. This phenomenon has not yet been accounted for although many scientists are reported to have visited the place.

Among other sights which I enjoyed during my stay at Hetampur were the ruins of some of the ancient places of historical interest. Of these the ruins of Shyamarupa-garh interested me most.The place is near Kendubillwa and lies at a distance of about ten miles from Hetampur. I was very eager to see the place and looked for a suitable opportunity. But its situation in an out-of-the way corner in the midst of a forest infested by wild animals, involves a journey very irksome and more or less risky. Fortunately I got a chance to visit the place under better conditions. My friend and neibour, Sj. Haripada Ghosh Hazra who unfortunately is no longer in our midst, one day asked me to shae with him a journey to a place called Bishnupur very near to Shyamarupa-garh. He was then the Law officer of the Hetampur Raj and his duty required his presence there. As it was summer vacation I readily accepted his proposal and prevailed upon principal B. C. Sen Gupta to join us. We three formed a merry party and started on the appointed day early in the morning. It was about ten in the morning when we reached Joydeva Kenduli where we greatly enjoyed the picturesque view of the Ajoy river. It was then mostly dry. Its sandy bed glistening in the sun was interspersed with shallow streams of shimmering water. Our caarriage stopped near the bank of the river and the two horses began to foam, having had to carry their load along a road deeply trenched and furrowed. The river bed, sandy and yielding, is unfit to be traversed by any sort of wheeled vehicle other than the despised bullock-cart. So we left the carriage behind and crossed the Ajoy on foot. As no conveyance was available on this side of the river we had to proceed leisurely on foot. Haripada Babh gradually accelerated his speed and Bhupendra Babu followed suit. I lagged behind as with my damaged knee-joints I could notkeep pace with them. Bhupendra Babu, although sedentary in habit, proved a good pedestrian while Haripada Babu, the heaviest of the party, excelled us all. We perspired heavily in the heat of the burning sun and an hour's time which brought us to our destination seemed almost an age. After resting a while we had cold bath and hot meals and then fell soundly asleep. We got up at about 3 P. M. and started for Shyamarupagarh. We proceeded along a zig-zag track through a forest full of thorns and brambles and eventyally reached the foot of a small hill crowned with the temple of Goddess Shyamarupa. It is said to have been erected by one Ichai Ghosh who according to traditional account headed a succefull revolt against a local ruler named Karna Sen and signalised his triumph by erecting a tower of victory known to this day as Ichai Ghosh's Deul. He was,

however, subsequently defeated and killed by Law Sen said to be a descendant of
Sen. These events are usually referred to the ninth century A. D. We noticed ex
ruins of buildings and walls, traces of ramparts, silted-up ditches and tanks, all po
to the antiquity of the locality and bearing silent witness to a forgotten chapter
early history of Bengal. We could not linger longer as the shades of evening were
upon us and so hastened towards Ichai Ghoih's Deul. It was almost dark when w
near it. The lofty tower rising to a dizzy height looked very solemn and impressi
the haze of twilight and for a time we were lost in the admiration of its solitary gran
But we were rudely awakened by flashes of lighting followed by a tremendous thu
clap. We hurried towards Bishnupur, taking a long circuitous route, the short
through the foresrt by which we had come being dangerously unsafe at night. Be
long we were overtaken by torrential showers of rain. Just imagine our plight. In
pitch darkness of the night we had to thread our way very cautiously along a road
dered perilously slippery by rain which continued to batter us for more than an h
Completely drenched and mudsplatted we managed to return to our destination. Ch
ing our dress we began to talk over cups of tea about our recent experiences. A
gentleman who heard our conversation remarked that it was providential that w
caped snake-bite near the Deul, a place notorious as the habitat of cobras. His words
a thrill into my body. We had adventures indeed and perhaps with vengeance.

Let me now switch back to Hetampur. It was here that I had my first experie
of village life. I was indeed accustomed to some of the amenities of the town life by
chnge to a rural atmosphere did not appear to me as something to be regretted. Perh
it was so because I had a partiality for the village, or perhap because I found Hetam
enjoying advantages which, not to speak of villages many big towns had to go out
first-grade college, a High school, a Sanskrit Tol, a charitable dispensary, all these w
exceptional in a village, in those days. Even now few villages have the benefit of th
institutions. At a time when the neighbouring town of Dubrajpur (at least ten tim
larger in area and population than Hetampur) had no High School and Suri, the adm
istrative head-quarters of Birbhum, was without any college, the small village of Hetamp
had the credid of having both. The High school of Hetampur was established in 1869 a
its college in 1997. It was as late as the thirties of the present century that Dubrajpur ca
to have a High school. It was the gift of a Marwari gentleman. Suri had to wait
another decade for a college, an accidental by-product of the Japanese bomb. It refle
no small credit upon the Hetampur Raj that it established educational institutions a
time when the doors of education were not so wide as now. In respect of medical aid
found Hetampur enjoying enviable facilities. There were provisions for treatment acordi
to different systems - Allopathy, Homoeopathy and Kaviraji. The Allopathic Charitab
Dispensary was then in charge of Sj. Murarai Mohan Sarkar, B. Sc. M. B, a cool-head
and competent physician. To his professional skill he added a generous heart which ma
him highly popular. Kaviraj Sarat Chandra Gupta was a sound physician a Sanskrit scho
and a devout Vaishnava. Besides his duties at the Raj Kaviraji dispensary he had to ma
age the Sanskrit tol and in both capacities he showed himself to the best advantage. D

. K. Dass represented Homoeopathy. He was a genial cimpanion and we greatly appreciated his amusing talks, specially those relating to the miracles of Homoeopathy. hus when I went to Hetampur I found that it had removed to a large extent two of the y grievances of the village absence of educational facilities and lack of medical aid.

Life in a village is usually dull and drab as it lacks many of the exciting amenities hich make city life more enjoyable. But thanks to the late Maharaja Ram Ranjan hakravarty, the placid stream of life at Hetampur was stirred into agreeable ripples on ertain definite occasions. He had made ample provisions for the celebration of religious stivals which greatly relieved the monotony of life at Hetampur. Of these the most pectaculaar was the Saraswati Puja. The attendant festival lasted for four days during hich Hetampur become the Mecca of the whole district. The village put on a colourful ppearance and was thronged by thousands of people including the district authorities. here were arrangements for various kinds of entertainments graded to suit the taste of fferent sections of the people. Exhibitions, both indistrial and agricultural, a fairly big ela or fair, cattle show, theatre and Jatra parties, sports which included horse race, ephant race and cart race, splendid fire works - all these and many more supplied rills and attractions which for the time made the people delirious with joy. It was quite tting that Hetampur then enjoying the proud position of being the only centre of gher education in the district, should attach great importance to the worship of the oddess of learning.

Besides the periodical celebration of festivals, Hetampur at times enjoyed shows ore thrilling and entertaining. This was largely due to the enlightened patronage of te Kumar Biswaranjan Chakravarty. Unfortunately for Hetampur, this cultured gentleman of great promise was cut off in the prime of his life. He had the happy knack of vesting everything he undertook with agreeable touches of novelty. He conceived andly and executed thoroughly. Who could imagine that the farfamed Corinthian lington team could be prevailed upon to play an exhibition game of foot-ball at a place small as aHetampur ? Kumar Biswaranjan did the miracle in 1937 and the people of irbhum and neighbouring districts came in thousands to witness an exciting game. cting upon the suggestion of the local Headmaster of the High school, Sj. Niradendu anyal, Biswaranjan invited the session of the A. B. T. A to Hetampur in 1939. The agnificent arrangemtnts he made for the reception of the teachers and the variety of elightful entertainments he supplied on the occasion are still fresh in my mind. His ntimely death deprived Hetampur of a fine chance of all-round improvement.

As I thinks of Hetampur, bubbles of reminiscences force themselves upon the rface of my mind in multi coloured hues. I now fix upon one of them and say something of a few experiences associatd with the college which I served for about twentyseven ears. I must however be very brief as I feel sure that the present occasion which has rompted me to wield a trembling pen has requisitioned much stronger hands to give a ller account of the college. When I joined the college I discovered that the duries assigned to me were rather heavy. I was to be the sole monarch of the department I would ve to survey and was left to rule or misrule with none else to share the responsiblity.

(67)

I, however, did not grumble and set to work with the zeal of a new recruit, always anxie fall below the mark. I plodded on for a few years and eventually had the supreme satisf the teacher when a student of my department stood first in History in the University tion. My life in the college was on the whole agreeable. In principal B. C. Sen Gupta I accommodating Chief while my colleagues were all very friendly and sympathetic. In p Professor Sarat chandra Sen who unfortunately is no longer with us, greatly impressed amiable manners, obliging disposition and above all by his child-like simplicity. The roll of the college wasmuch below what a firstgrade college should have, but the paucity o was not without compensating advantages. It made possible that personal contact betwe ers and students, the absence of which is without doubt an undersirable feature of mc over crowded colleges now-a-days. We freely mixed with the students taking part in th and in the feasts which they arranged on many an occasion. At first I found the students keen on sports but with the arrival of a few sportsman students their sporting sprit w lated so that within a short time the foot-ball team of the college became one of the be district. Kumar Biswaranjan noticed it with satisfaction and gave a further stimulus by or a shield tournament on a magnificent scale. For a time Hetampur became an important sporting activity. At times the college professors were called upon to do bits of social se 1935 the district of Birbhum was thretened with an awful shortage of food. The Gov called it scarcity although famine conditions prevailed in the villages. Mr. B. K. Guha who was then the distrtict and Sessions Judge of Birbhum, was moved by the appalling d the people. He made an excellent non-official organisation and set up commitees of loca tackle the situation. He set an inspiring example by moving from door to door collect the subscriptions. At his instance our college staff headed by our worthy principal foll example and the students of our college gladly co-operated with us.

Our college had its dark days. The number of students, never very large, began thinner and thinner with the establishment of colleges in the neighbourhood. The Kumar Biwaranjan was followed by serious complications in the affairs of the Hetam which threatened the financial stability of the college. His son Rebatiranjan was then a m while Suranjan representing the direct line of the late Maharaja was then a lisping ch situation presented a splendid opportunity to sharks and sharpers whose spoliation impo the Trust Estate and threatened with ruin all the institutions dependent upon it for finar Amidst this surrounding gloom, flickered a fitful ray of hope. Maharajkumari Jyostnar highly intelligent lady of broad views, unfortunately widwoed in the prime of her life, wa to a sense of responsibility by the report of the prevailing confusion. She was anxious guard the interests of her only son Suranjan and to maintain the prestige of the Hetampu preserving all the benevolent institutions. It was largely owing to her efforts that the became a Government-sponsored one. Thus after weathering many a strom our college h a safe rufuge and it gives me great pleasure to learn that it is going to celebrate its D Jubilee. New wine has been poured into the old bottle. It is my fervent hope that un auspices the college will continue its career of usefulness with renewed vigour and develo model institution of its kind . [Reprinted from Diamond Jubilee Magazine of the colleg 1958]

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

ড: বিমানবিহারী মজুমদার, এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি
(কলেজ সমূহের পরিদর্শক, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা), (প্রাক্তন অধ্যাপক)

আমি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হই। সে সময় সিউড়ীতে কোন কলেজ ছিল না। বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বভারতীও তখন কলেজী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল না। বীরভূম জেলার একমাত্র কলেজ ছিল হেতমপুর। ছোট্ট ছবির মতন এক সুন্দর প্রাসাদ। আর সব মাটির ঘর। রাজবাড়ীর লোক ছাড়া অন্য কাহারও পাকা মকানে বাস করিবার অধিকার ছিল না। রাজারা সাধারণ প্রজাদিগকে ইটের বাড়ী তৈয়ারী করিতে দিতেন না, কেননা তাহাতে তাহাদের কায়েমী অধিকার জমিতে পারে এবং রাজাদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে। গ্রামে মধ্যবিত্ত লোক ছিল খুব কমই। রাজাদের কর্ম্মচারী, পুরোহিত, আশ্রিত ব্যক্তিরা গ্রামে বসবাস করিতেন; গ্রামে ও তাহার আশেপাশে অনেক বাউড়ী, বাগদী, সাঁওতাল বাস করিত। কালো-কালো চেহারা, স্বাস্থ্যের দীপ্তি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গা দিয়া যেন তেল চুয়াইতেছে। পরনে তাদের মলিন বস্ত্রখণ্ড, কিন্তু মুখে সন্তোষের মধুর হাসি। মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজিয়া হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পথ চলে। মানসায়র হইতে সোজা মহারাজ মহিমানিরঞ্জনের বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় আধ মাইল জমিতে রাস্তার দুই পাশে ঘন শালবন। দিনের বেলাতে ওই শালবনের মধ্যে যেন এক রোমাঞ্চকর রহস্য ঘনীভূত হইয়া থাকিত।

গ্রামের আবহাওয়াতে আমি মানুষ। কলিকাতায় এম্-এ, পড়িবার সময় আমার অবস্থা হইয়াছিল জল ছাড়া মাছের মতন। হেতমপুরের স্নিগ্ধ পরিবেশে আসিয়া আমি অসীম শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিলাম। ক্ষীণকায় গোঁফের রেখা সবে দেখা দিয়াছে, ছোট্টখাট্টো মানুষটিকে দেখিয়া অনেকেই আমাকে পড়ুয়া বলিয়া ভ্রম করিত। প্রথমে আসিয়া গিরিডাঙ্গা* হোষ্টেলে উঠিলাম। একজন ভদ্রবর ছাত্র থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। সে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এসো এসো, কোন্ ইয়ার?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইয়ারের লোভেই আসা, দেখি কোন্ ইয়ার আছে"? সে একেবারে গদগদ হইয়া কহিল, "খাসা, তামাক খাও?" আমি মাথা ঝাঁকাইয়া "না" বলায় সে অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী করিল, "এখন চলে না বটে, কিন্তু এখানে থাকতে হলে খেতেই।" পরের দিন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে ঢুকিতেই ওই ছাত্রটি বিস্ফারিত নয়নে আমার পানে চাহিয়াই সেই যে অন্তর্দ্ধান করিল, তাহার পর আর তাহাকে কোন দিন কলেজে বা হোষ্টেলে দেখিতে পাই নাই। পরে খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম যে, সে সোজা কলেজ হইতে দুবরাজপুর ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেন ধরিয়াছিল এবং পরে লোক মারফৎ ট্রান্স্ফার সার্টিফিকেট লইয়া অন্য কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল।

এখনকার দিনে বিশেষ করিয়া সহর বাজারে ছাত্রদের মধ্যে এরকম লজ্জা পাওয়াকে বেকুবি বলিয়া উপহাস করা হয়। কিন্তু ৩৪ বৎসর আগে হেতমপুরের ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপকের প্রতি অসাধারণ শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও গুরু শুশ্রূষার ভাব ছিল। ছাত্রেরা অধ্যাপকের কোন ব্যক্তিগত কাজ করিয়া দিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিত। আমি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি আমার ছোট তিন ভাই, স্ত্রী ও ছয় মাসের পুত্রকে হেতমপুরে লইয়া আসি। নূতন সংসার পাতিতে হইবে; নূতন জায়গা এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতাও আমাদের কাহারও ছিল না। ছাত্রেরাই উদ্যোগী হইয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিতে বসিল। কেহ বাজার হইতে কয়লা আনিয়া দিল, কেহ চাল ডাল তরকারী আনিল, কেহ জল তুলিয়া দিল। চাকরটি ঘর ঝাড়ু দিতে দেরী করিতেছে দেখিয়া একজন ছাত্র নিজেই হাতে ঝাঁটা তুলিয়া লইল, অপর একজন উনানে আঁচ দিয়া দিল। আমরা বৈকাল ৫টা আন্দাজ সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। ছাত্রদের সহায়তায় সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে আমাদের ঘর-সংসার পাতা হইল ও উনানে রান্না চড়িল।

এই সহায়তা যে কেবল একদিন পাইয়াছিলাম তাহা নহে। প্রায় প্রত্যহই ছেলেরা আসিয়া নানা ভাবে আমাদের সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া দিত। বৈকাল বেলাতে আমার পুত্রকে তাহারাই কোলে করিয়া রাখিত। তাহাকে কোলে লইবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া যাইত। আমিও শালবাগানের আলোছায়ায় বসিয়া ছাত্রদের সঙ্গে ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতাম। হেতমপুরে খুব ভাল মুড়ি পাওয়া যাইত। তাহাই তেল নুন দিয়া মাখিয়া আমরা বৈকালে জলখাবার খাইতাম। দুই পয়সার মুড়িতে ৭।৮টি ছাত্র সহ আমার পরিতৃপ্তি সহ জলখাবার হইত। মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে দেশ বিদেশের ইতিহাসের গল্প ছাত্রদের মনোরম লাগিত। তাহারা ইতিহাসের মধ্যে রসের সন্ধান পাইল।

---

* বর্তমানে হোষ্টেলটি কলেজের হাতে নাই। এই স্থানে এক টি-বি নিরাময় কেন্দ্র হইয়াছে। কলিকাতা "নিরাময়" সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। (সঃ হী-জ-স)

ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে অনেকেই লাইব্রেরী হইতে ইতিহাসের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। ঘরে যাহা পড়িত বেড়াইতে আসিয়া তাহা লইয়া প্রশ্ন করিত, তর্ক করিত, আলোচনা করিত। আলোচনার মীমাংসার জন্য আমাদের নূতন নূতন বইয়ের প্রয়োজন হইত; কিন্তু বই পাওয়া সহজ ব্যাপার হইত না।

পাড়াগাঁয়ের কলেজ। ছোট্ট তাহার লাইব্রেরী। আয় তাহার সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। কয়েক স্থানের জমিদারী খাজনা হইতে কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ফসল কাটার পর প্রজারা খাজনা দিত। সুতরাং বছরে দুইবার খাজনা উসুল হই। এ সময় আমাদের বেতনের টাকা শোধ করিয়া দেওয়া হইত। বাকি দশ মাস আমরা দশ বিশ টাকার বেশী পাইতাম না। ছাত্ররা নিয়ম মত ফিস্ জমা দিত না। কোন দিন কোন ছাত্র ফিস্ দিলে বা ভর্ত্তি হইলে সেই টাকা যাহার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহাকে দেওয়া হইত। ইংরাজী, অঙ্ক, ইতিহাস, সংস্কৃত ও বাংলার এক একজন করিয়া অধ্যাপক ও একজন অধ্যক্ষ এই সাত জন লইয়া কলেজের শিক্ষক মণ্ডলী।

গ্রামেরই এক জন ভদ্রলোক কলেজের কেরাণীর কাজ করিতেন। তিনি প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর রাখিতেন। সুতরাং কাহার কোন্ দিন টাকার সবচেয়ে প্রয়োজন তাহা লইয়া কোন বাদবিতণ্ডা হইত না! হেতমপুরের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অবশ্য নগদ টাকার প্রয়োজন হইত কেবলমাত্র তরকারী কিনিবার জন্য, লোক-লৌকিকতা করার জন্য এবং স্থানান্তরে যাইবার জন্য বা চিঠিপত্র লেখার জন্য। গ্রামের এবং দুবরাজপুরের সকল দোকানদারই অধ্যাপকদিগকে ধারে কাপড়, জামা, ঔষধ, সন্দেশ-মিষ্টান্ন, চাল ডাল তেল নুন বিক্রয় করিত। মাছওয়ালী রোজ বাড়ীতে মাছের রোজান্ দিয়া যাইতনা। মুড়িওয়ালী মুড়ি দিত। গ্রামে পোষ্টাফিস থাকিলেও ধারে খাম পোষ্টকার্ড কিনিতে পাওয়া যাইত। রেল স্টেশনেও ধারে টিকিট মিলিত না। শাক, তরকারী বেচিবার হাট বসিত সপ্তাহে দুই দিন। হাটুরেরা অন্য গ্রাম হইতে আসিত, সেইজন্য নগদ দাম দিয়া উহা খরিদ করিতে হইত। মাসে ২।৩ টাকার তরকারী কিনিলে ৫।৬ জনের একটি ছোট্ট পরিবার সুখে-স্বচ্ছন্দে খাইতে পারিত। একে তো জিনিষপত্র ছিল অসম্ভব রকমের সস্তা; তার উপর আলু, বড়ি, পোস্ত, খেরো ও ডাঁটা ছিল প্রধান খাদ্য। শীতের শেষে চালানি কপি পাওয়া যাইত। চার পাঁচ পয়সা দিয়া একটা বাঁধাকপি কিনিলে দুই তরকারী হইত। আলুর সের তিন পয়সা চার পয়সা ছিল।

আমরা যে দিন বেতন পাইতাম সেদিন গ্রামের জীবনে একটা স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইত। দুপুর বা বৈকাল নাগাদ বুঝা যাইত যে রাজবাড়ী হইতে কলেজের প্রাপ্য টাকা পাওয়া যাইবে কিনা। সাধারণতঃ সন্ধ্যার পর আমাদের টাকা গুণিয়া দেওয়া হইত। আমরা একটা মোটা চাদর লইয়া যাইতাম। তাহাতে ৪।৫ মাসের বেতন নগদ রূপার টাকা বাঁধিয়া আনিতাম। তখন পাড়াগাঁয়ে নোটের প্রচলন বেশী হয় নাই। রায়তেরা রূপার টাকায় খাজনা দিত। সুতরাং আমাদিগকেও তাহাতেই বেত হইত। বাড়ী ফিরিয়াই দেখিতাম সারবন্দী হইয়া ম মুড়িওয়ালী, ধোপা, গোয়ালা, মুদি, কাপড়ের দোকান বসিয়া আছে। বাড়ীর ভিতরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই তাহাদের মিটাইয়া দিয়া হালকা হইতাম।

গ্রামের সাদামাঠা জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত ছিলাম বলি একশত টাকা বেতন পাইলেও চৌদ্দমাস চাকুরীর মধ্যে ৫ টাকা জমিয়াছিল অর্থাৎ কাজ ছাড়িয়া পাটনায় আসি ওই টাকা হাতে পাইয়াছিলাম। হেতমপুর দুবরাজপুর, সিউড়ী শহরেও তখন সিনেমা ছিল না। সুতরাং এ খরচের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম। দুইটি ভা ও একটি ভাইকে বাড়ীতে পড়াইবার খরচ নির্বাহ করিয় টাকা বেতনে হাতে টাকা জমাটা আজ অবিশ্বাস্য যদি মাসের মাস নগদ বেতন পাইতাম তাহা হইলে জমিত না। কেননা, আর কিছু না হউক বই কে মিটাইতে টাকা খরচ হইয়া যাইত নিশ্চয়ই। কিন্তু টাকা না পাওয়ায় কলেজ লাইব্রেরীতে বই কেনার বাহাদুরের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হইত। একবার কলেজের একজন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন "পুরা একশ' দিয়ে ফার্ষ্ট ক্লাস এম্-এ-কে বহাল করলাম, আর বই পড়ে তবে ছেলেদের পড়াতে চায়! সেকালে পণ্ডিতমশায়দের সব বই মুখস্থ থাকতো।" এরূপ ভর্ৎসনাতেও আমি দমিতাম না। একজনের কাছে অন্য কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যাইয়া বই কেনার জন্য আবদ সেজমহারাজ মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্যোৎ ছিলেন। তিনি বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা সাহায্যে কলেজ লাইব্রেরিতে অনেকগুলি ভাল কিনিয়াছিলাম।

তেত্রিশ বৎসর পূর্বে হেতমপুর কলেজের প্রিন্সিপ বাংলা দেশে হৈ চৈ বাধিয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল ধর্ম্মদাস বি এ ও এম্ এ পরীক্ষা পাশ করেন নাই; অন্য দত্ত পাশ করিয়াছিলেন এবং ইনি তাঁহার ডিগ্রোম কপি জোগার করিয়া কাজ চালাইয়াছিলেন। এই কে হইবার পর অবশ্য ভদ্রলোক অন্যত্র চলিয়া যান। ক বিরুদ্ধে কোন মামলা মোকদ্দমা চালান নাই। তিনি না হইলেও ইংরাজীটা ভালই জানিতেন। বি এ বাইবেল পড়াইতেন। সে সময় বাইবেল পাঠ্য-তালি ছেলেরা তাঁহার অধ্যাপনায় কখনও অসন্তোষ প্রকা পড়ানো ছাড়া রাজবাড়ীর নানান্ রকম কাজে তি মুসাবিদা করিয়া দিতেন। সেসব লেখাও বেশ লোকহিসাবেও ধর্ম্মদাসবাবু খারাপ ছিলেন না। স অমায়িক ভাবে মেলামেশা করিতেন। তাঁহার বাড়ী পান্তুয়া তৈয়ারী হইত। যখনই তাঁহার বাড়ীতে বে

তখনই তিনি পান্তুয়া খাইতে দিতেন। তিনি কলেজের দোতলায় এক অংশ লইয়া সপরিবারে বাস করিতেন। আমার বড় ছেলে ভক্তকে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। প্রায়ই আমাদের কোল হইতে লইয়া তিনি তাহাকে খেলা দিতেন।

এই প্রসঙ্গ উত্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে এই দেখানো যে, সে সময়ে ছাত্র ও অধ্যাপকেরা অধ্যক্ষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক পরিবারভুক্ত হইয়া থাকিতেন। পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি যথেষ্ট ছিল। ছাত্রদের মধ্যে discipline বা নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করিবার কোন প্রশ্নই উঠিত না। ছেলেরা কেহ কেহ যে মাঝে মাঝে দুষ্টামি না করিত তাহা নহে, কিন্তু বাপ বা বড় ভাই যেমন ছেলে বা ছোট ভাইকে স্নেহের সঙ্গে সাবধান করিয়া দেন আমরা সেইরূপ করিতাম। তাহাতে যথেষ্ট সুফল দেখা যাইত।

আজ পাড়াগাঁয়ের ছোট কলেজেও সে-যুগের হেতমপুর কলেজের মতন আবহাওয়া দেখা যায় না। বহুদিন ধরিয়া রাজনীতিতে অসহযোগ ও আইন অমান্য করার ফলে আমাদের দেশের সামাজিক জীবনের সকল স্তরে তাহার প্রভাব পরিয়াছে। ছেলেরা পাশ করিয়াও ভাল কাজ-কর্ম্ম পায় না বলিয়া পড়াশুনা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর তাহারা শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। শিক্ষকেরাও আজকাল আর ছাত্রদের সঙ্গে সেকালের মতন এক প্রাণতা অনুভব করেন না। এই সকল কারণে, এখনকার দিনে কলেজ জীবন আর সেকালের মতন নাই।

---

* লেখাটি কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের হীরক জয়ন্তী সংখ্যা থেকে পুর্ণমুদ্রিত।

কলেজ স্মৃতিকথা

শ্রীশিবশরণ চৌধুরী
প্রধান অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ
কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ

পিতৃনিবাস শ্রীধাম নবদ্বীপ। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম মাতুলালয়ে কৃষ্ণনগরে। নবদ্বীপেই শিক্ষারম্ভ হয়। হিন্দুস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সিটি কলেজে আই-এ, স্কটিশচার্চ্চ কলেজে বি-এ, ইউনিভারসিটিতে এম-এ অধ্যয়ন করি। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চুয়াডাঙা সাবডিভিশনে মাস খানেক ওকালতি করিলাম। ব্যবসাটা ভাল লাগিল না। ভাবিলাম এই জন্যই কি এত খাটিয়া খুটিয়া লেখাপড়া শিখিলাম? ভগ্ন মন লইয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলাম। ভরসা, খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের অবস্থা ভাল করিয়া লইব। ট্রামে এক জায়গায় যাইব বলিয়া ঠিক করিয়াছি, বন্ধুবর বিমানবিহারী মজুমদার এম-এ (তখনও তিনি পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন নাই) মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার বর্ত্তমানে পাটনায় শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তিনি তখন হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। কলিকাতায় আসার কারন জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে মনের দুরাবস্থার কথা খুলিয়া বলিলাম। সহানুভূতি দেখাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন কলেজে চাকুরী হইলে লইতে পারেন কি?" আমি উত্তর দিলাম, "এই দন্ডে, এখনই লইব।"

বিমানবিহরী আমাকে সঙ্গে লইয়া তখনই কলিকাতায় ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের বাড়িতে মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহিমানিরঞ্জন বীরভূম হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। ইনিই কলেজ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। মহিমানিরঞ্জনের কলিকাতা বাড়িতে সেই সময় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। মহারাজকুমার আমার সহিত আলাপে সন্তুষ্ট হইলেন, তদুপরি সাহিত্যরত্ন মহাশয়ও আমার জন্য সুপারিস করাতে মহিমানিরঞ্জন আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সুপারিশ পত্র লইয়া আমি যখন হেতমপুরে আসি তখন মে মাস, কলেজ ছুটি হইয়া গিয়াছে। গৌরাঙ্গ মন্দিরে সারাদিন থাকিয়া রাজা বাহাদুরের সহিত দেখা করিলাম। চাকুরী হইয়া গেল। বেতন মাসিক আশি টাকা। বড়ি, পোস্ত ও কলাই ডালের আস্বাদন লইয়া কলিকাতা ফিরিলাম। সে ইংরাজী ১৯২৫ সনের কথা। একাদিক্রমে সাতাশ বৎসর কাল কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যপনা করিয়া ১৯৫৩ সালে শারীরিক অসুস্থতার জন্য হেতমপুর কলেজ হইতে আবসর গ্রহণ করি।

আমি যখন হেতমপুরে আসি তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ বি-এল। তিনি এই কলেজেই গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপক থাকাকালে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী ধর্ম্মদাস দত্ত। এই এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ ভদ্রলোক শ্রীহট্টের কোন এক ধর্মদাস দত্ত এম-এ, বি-এল এর নাম সাদৃশ্যে হেতমপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদাধিকার করেন। পরে ধরা পড়িয়া অপসারিত হইলে ভূপেন্দ্রচন্দ্র অধ্যক্ষ হন।

সে সময়ে কলেজে অধ্যাপক ছিলেন এগারো জন। অধ্যক্ষ ভূপেন্দ্রচন্দ্র গণিতের অধ্যাপক হইলেও দর্শনশাস্ত্রের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। ব্যক্তিগত সদাচার ও আভিজাত্য তাঁহাকে কি ছাত্র কি অধ্যাপকসকলের চক্ষেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তর্কবিতর্কে নিজের মত আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য তাঁহার একটি জেদের পরিচয় পাওয়া গেলেও মানুষ হিসাবে তিনি ভালই ছিলেন। ভূপেন্দ্রচন্দ্র সাধারণের সহিত বড় একটা মিশিতেন না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আপদে তিনি অন্যান্য অধ্যাপকদের লইয়া হেতমপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ক্লিষ্টসাধারণের জন্য চাঁদা তুলিতেন।

কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় শতখানেক মাত্র। হেতমপুরের পশ্চিমাংশে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের কিছু দূরে শাল মহুয়া জঙ্গলের মধ্যে ছিল মানসায়র ছাত্রাবাস। মহুয়া ও শালগাছ গুলির হ্রাস বৃদ্ধি ছিল না। আমি তাহাদিগকে একই আবস্থায় দেখিয়াছি। তাহাদের চেহারা দেখিয়া মনে হইত গরিবের ঘরের ছেলেরা কোন রকমে মাথা খাড় রাখিয়াছে। কিন্তু ঋতুপর্য্যায় অনুসারে অবস্থানুরূপ সাজগোজের তাহাদের কমতি ছিল না। বর্ষার শ্যাম সমারোহে তাহারাও নবলাবণ্যে ঝলমল করিয়া উঠিত। পাপিয়ার গানে আবেগকরুণ ঝঙ্কার হয়তো তাহাদের মনকে দোলা দিত। দেখিতাম প্রতি প্রভাতে বন্য ছত্রক কুড়াইবার জন্য তথাকথিত ইতর বালকবালিকাদের হুড়াহুড়ি। শীতে মহুয়া ফুলের মদির গন্ধ আমাকে অক্ষয় কুমার বড়ালের কবিতাংশ মনে করাইয়া দিত -

কুজ্ঝটি সায়াহ্নে হেরি মৃগমুখ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর তীরে চকিতা চঞ্চলা।
মদির মধুর রাতে ম্লান জ্যোৎস্নারাতে
লয়ে তুমি বক্ষে শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা।

বসন্তে কোকিল শ্যামার কলঝঙ্কার আমাকে আকুল করিয়া তুলিত। দশ বৎসর আমি মানসায়র বোর্ডি-এ ছাত্রদের মধ্যে বাস করিয়াছিলাম।পরে পৃথক বাসের সুযোগ পাইয়া পরিবারবর্গকে হেতমপুর আনাইয়াছিলাম। কুমার বিশ্বরঞ্জন আমার এই বাসায় বাসের সুবিধা দিয়াছিলেন।

গিরিডাঙ্গা নামক স্থান হেতমপুরের উত্তরে স্থিত প্রান্তরে ছিল গিরিডাঙ্গা কলেজ বোর্ডিং। আর গ্রামের মধ্যে কলেজের কাছে ছিল একটি মেস্। ছোট একটি পুষ্করিণীর নামানুসারে ওই পুষ্করিণীর তীরবর্ত্তী ছাত্রাবাস মানসায়র বোর্ডিং নামে পরিচিত হইতেছে। হেতমপুরে বৃহস্পতি ও রবিবারে হাট চলে। মানসায়র বোর্ডিং-এর অদূরেই দুবরাজপুর। মানসায়রের পশ্চিমে মাত্র মাইল খানেকের পথ।সোমবার ও শুক্রবার দুবরাজপুরের হাট। এই চারিটি হাটে প্রচুর তরকারি আমদানী হয়। সে সময় বেশ সস্তা দামেই হাটের জিনিসপত্র পাওয়া যাইত। দুই টাকার উপর দুই এক আনা ধরিয়া দিলেই বেশ ভাল চাউল মিলিত। ডালও বেশ সস্তা ছিল। মাছের সের ছিল ছয় আনা। সরিষার তৈল মিলিত আট আনা। ভইসা ঘির দাম ছিল সের প্রতি এক টাকা দশ পয়সা। আলু পলের আনা অথবা এক টাকা মণ।

মানসায়র বোর্ডিএ টিফিনের সময় আমরা লুচি খাইতাম। প্রতি মাসে দশ টাকা খরচ দিয়া মানসায়র বোর্ডিংএ থাকিতাম বলিয়া লোকে মানসায়র বোর্ডিং এর নাম দিয়াছিল "বাবুদের বোর্ডিং।" সে আমলে তিন টাকা চৌদ্দসিকার একজন ছাত্রের স্বচ্ছন্দে একমাস চলিত।

রাজবাড়ি হইতে মাঝে মাঝে আমরা নিমন্ত্রণ পাইতাম। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালই ছিল। রাজবাড়িতে ভোজে কাজে সাঁওতাল পরগণার খাঁটি ঘি আসিত। মহারাজা রামরঞ্জন ও মহারাণী পদ্মসুন্দরীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধে বেশ ধুম ধামের সহিত ব্রাহ্মণদিগকে, অধ্যাপকদিগকে ও কর্মচারীদিগকে খাওয়ানো হইত। সরস্বতী পূজাতেও খুব সমারোহ হইত। মেলা বসিত, কলিকাতার থিয়েটার, বীরভূমের কবি, ঝুমরী, লেটোনাচ তিনদিন ধরিয়া চলিত। সাহেব সুবোদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইত। কৃষিশিল্পের প্রদর্শনী কলেজে বসিত ও মেলার শেষে প্রদর্শিত শিল্পদ্রব্যের ও গবাদি পশুর গুণানুসারে তাহাদের মালিকদের পুরস্কৃত করা হইত। তখনকার দিনে অধ্যাপক-ছাত্র সম্বন্ধ বেশ অন্তরঙ্গপূর্ণ ছিল। কলেজ বর্জন ও অধ্যাপকদের তিরস্কার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আমি পুনরায় হেতমপুর কলেজে আসিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যক্ষ একজন সুযোগ্য অধ্যাপক। কলেজের দ্রুত উন্নতি তাঁহার সংগঠন শক্তির পরিচায়ক। বর্ত্তমানে শিক্ষার পরিধি বিস্তৃত হইতেছে। বর্ত্তমানের জগতে দাঁড়াইয়া অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতেছি - সেকালে ও একালে কত পার্থক্য।

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের এই ষষ্টি পূর্ত্তি উৎসবে মহারাজা রামরঞ্জন ও মহারানী পদ্মসুন্দরীর পুণ্যকথা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিতেছি রাজা সত্যনিরঞ্জন, মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন ও তাহার অপর দুই ভ্রাতাকে এবং রাজবংশের প্রথম গ্র্যাজুয়েট কুমার বিশ্বরঞ্জনকে। দুঃখের বিষয় কুমার বিশ্বরঞ্জন ও কুমার রাধিকারঞ্জন আকালে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিলে এই উৎসবের দিনে কত না আনন্দিত হইতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মহারাজা ও মহারাণী সাধনোচিত ধাম হইতে তাহাদের অতীত কীর্ত্তি এই বিদ্যামন্দিরের ষষ্টি পূর্ত্তি উৎসব প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে আশিস্ বর্ষণ করিতেছেন।

(পুনর্মুদ্রিত)

কলেজ - স্মৃতি

শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল
(প্রাক্তন ছাত্র)
হেতমপুর, বীরভূম

আমার পৈত্রিক বাসবাটী বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গাটিকুরী ইউনিয়নের বহড়ান গ্রামে। আমার ম
"গৌরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় হেতমপুর গ্রামের একজন বুনিয়াদী বাসিন্দা ছিলেন। তাঁহার পিতামহ "শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্
সহধর্ম্মিনী "রামমণি দেবী হেতমপুরের মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পিতামহ "বিপ্রচরন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহোদর
ছিলেন। মাতমহের আলয়ে বাল্যাবধি পরিবর্ধিত হইয়া এবং স্থানীয় রাজ উচ্চবিদ্যালয়ে ও কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ণ করিয়া
ক্রমশঃ হেতমপুরের প্রতি আকৃষ্ট হই এবং বর্ত্তমানে এই গ্রামেরই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছি।

ইংরাজী ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া আমি হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজে প্রবেশা
লাভ করি। সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা হইলেও কলেজে অধ্যয়ণ সময়ে ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে যে প্রীতির
দেখিয়াছিলাম অদ্যাবধি তাহা আমার স্মৃতিতে জাগরুক রহিয়াছে।

তৎকালে কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় আয়োজন যথেষ্ট ছিল না। আই-এ ও বি-এ ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনার
ব্যবস্থা কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়া এতদঞ্চলে বহু ধনবান ছাত্র বিজ্ঞান বিষয়ে পড়িবে বলিয়া বহরমপুর
কলিকাতায় চলিয়া যাইত। বীরভূম জেলায় ও পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল পরগণা এলাকায় আর কোন কলেজ না থাকায় এই সব অ
অধিকাংশ ছাত্রই এই বিদ্যায়তনে শিক্ষা লাভ করিতে আসিত। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমশঃ বিজ্ঞান শিক্ষার চাহিদা হৃদয়ঙ্গম করিতে
আই-এস্-সি পড়াইবার অনুমোদন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে লাভ করিয়া এতদঞ্চলে ছাত্রগণের একটি বড় আভ
করিলেন। ঐ বিষয়ে কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

কলেজ গ্রন্থাগারের ব্যবহার দ্বারা জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়া থাকে; কিন্তু তৎকালে অধিকাংশ ছাত্র
গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাইত না। কলেজ গ্রন্থাগারের আলমারিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি সন্নিবেশিত থা
কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই উক্ত গ্রন্থাদি পাঠ করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত ছিল এবং এই বিরাট গ্রন্থাগার প্রকৃত প্রস্তাবে ক
ছাত্রগণের কোন কাজেই লাগিত না। গ্রন্থাগারটি মোটেই সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না বলিয়া বহু মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অযত্ন ও রক্ষিত
পর্বত গুহাভ্যন্তরে রক্ষিত বৌদ্ধযুগের গ্রন্থাদির ন্যায় ধুলিপ্রোথিত অথবা কীট দুষ্ট অবস্থায় আলমারীর মধ্যে আত্মগোপন
থাকিত।

কলেজের দ্বিতলে পশ্চিমদিকের একটি লম্বা হলে একটি বড় টেবিল থাকিত এবং উহাকে Common R
বলা হইত। তাহাতে আগের দিনের দুই একখানি সংবাদপত্র মাঝে মাঝে দেওয়া হইত। সংবাদপত্রের মধ্যে বিশেষ করিয়া Sta
man পত্রিকাটি দেখা যাইত। বাংলা সংবাদপত্র অথবা ভাল মাসিক পত্রিকা দেওয়ার কোন ব্যবস্থায় ছিল না। শুনা যায়,
সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ছাত্রগণ জতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া কলেজ কর্তৃপক্ষ ঐ সব
ছাত্রদের সমক্ষে স্থাপন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ছাত্রগণ হোষ্টেলে বা নিজগৃহে ওই সব পত্রিকা পাঠ করিয়া নি
চহিদা মিটাইয়া লইত। তৎকালে আনন্দবাজার পত্রিকা দুই পয়সা এবং অমৃতবাজার পত্রিকা একআনা মূল্যে বিক্রয় হইত
ছাত্রগণ অতি সুলভ মূল্যে পত্রিকা পাঠের সুবিধা পাইত বলিয়া কলেজের সংবাদপত্র সরবরাহের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করিত
ষ্টেটসম্যান্ পত্রিকাটির প্রতি ভ্রুকুঞ্চন ছাড়া বেশী ছাত্রকে উহা পাঠ করিতে দেখা যাইত না। কলেজে যে সমস্ত ভাল মাসি
পত্রিকা আসিত তাহা সাধারণতঃ প্রিন্সিপ্যাল আথবা অধ্যাপকগেণের বাসাতেই আত্মগোপণ করিয়া থাকিত। এই কলেজের
তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনে পিছাইয়া ছিল না। আমার সহপাঠী শ্রী কালিপদ ঘটক সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান
বহু লাঞ্ছনা ভোগ ও কারাবরণ করিয়াছিলেন, সেকথা আমার আজও মনে আছে।

কলেজের আয়োজন অপ্রচুর থাকিলেও শিক্ষা দানের মান অন্যান্য কলেজের তুলনায় এই কলেজে কখনোই নীচু ছিল না। আমি এই কলেজে প্রবেশের পূর্বে যে সমস্ত খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ এখানে অধ্যাপনা করিয়া এই কলেজের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যক্ষ অতুল প্রসাদ সেন, অধ্যাপক শ্রী অনিলবরণ রায়, ° কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী বিমানবিহারী মজুমদার ও °শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের অধ্যয়নকালে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যপকের সান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীশিবশরণ চৌধুরী ও অধ্যাপক °শরৎকুমার সেন, ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী লাবণ্য লাল মুখোপাধ্যায়, দর্শনের অধ্যাপক শ্রী বরেন্দ্রনাথ সোম, মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক শ্রী নীরোদবরণ ভট্টাচার্য্য, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত অধ্যপকের শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমন চমৎকার ছিল যে, তাঁহারা ক্লাসে অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের মধ্যে মোহজাল বিস্তার করিতে পারিতেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তিনজন অধ্যাপকের অধ্যাপনার মাধুর্য্য আজও আমার স্মরণ আছে। অধ্যাপক শ্রীশিবশরণ চৌধুরী মহাশয় আমাদের সময়ে ক্লাসে সেক্সপীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" ও " দি টেম্পেষ্ট" পড়াইতেন। ক্লাসে পড়াইবার সময়ে তাঁহার মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রকাশ পাইত। সময় সময় বহু ছাত্র বই ছাড়িয়া তাঁহার মুখের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকাইয়া থাকিত। মনে হইত আমরা রঙ্গমঞ্চে সত্যকার অভিনয় দেখিতেছি। একবার যে সমস্ত ছাত্র তাঁহার বক্তৃতা মন দিয়া শুনিত তাহাদের আর বাসায় পড়িবার প্রয়োজন হইত না। দ্বিতীয় অধ্যাপক ছিলেন °শরৎকুমার সেন। তিনি হেতমপুর কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন এবং পরে এই কলেজেরই ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া দীর্ঘকাল কলেজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক বালক সুলভ স্বভাব ছাত্রগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হইয়াও যে সাধারণ জীবন যাপন করিতেন তাহা তাঁহাকে ছাত্র সমাজে খুবই প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। ছাত্রদের মধ্যে কিভাবে জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধি করা যায় তাহা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া কোন্ ছাত্র কিভাবে পড়াশুনা করিতেছেন তাহার সংবাদ লইতেন এবং পাঠকালে কোন ছাত্র ভুল পড়িতেছে জানিতে পারিলে যতক্ষণ না সেই ভুল সংশোধিত হইত ততক্ষণ তাঁহার আহার নিদ্রা থাকিত না। কলেজের বাহিরে ছাত্রদিগকে বিদ্যোৎসাহ দেওয়া ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কাজ। ছাত্রদের মধ্যে তিনি ভাল মন্দ বিচার করিতেন না; বরঞ্চ মন্দ ছাত্রই তাঁহাকে বেশী আকর্ষণ করিত। তাঁহার মৃত্যু এই কলেজকে একটি প্রকৃত শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী লাবণ্যলাল মুখোপাধ্যায়ের কথা আমি নিয়তই স্মরণ করি। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও মধুর স্বভাব ছাত্রসমাজকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার অধ্যপনার গুণে ইতিহাসের ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ ফল লাভ করিত। ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞানার্জনে তিনি সর্বদা ছাত্রগণকে সাহায্য করিতেন। আমার অধ্যয়ন সময় কালে অধ্যাপকগণের অতি সহজ জীবন যাত্রা প্রণালী এবং মহৎ চিন্তাদর্শ অনুসরণযোগ্য ছিল।

আমার সহপাঠী ছাত্রগণের মধ্যে বহু ছাত্রবন্ধুর কথা আজও মনে পড়ে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মধুরভাষী, নির্ভীক ও চরিত্রবান ছিলেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে দুই একজন অগাধ স্মৃতিশক্তির জন্য ছাত্রসমাজে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। শ্রী কমলাক্ষ ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার প্রথম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত অতি সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আর একজন ছাত্রবন্ধু শ্রী কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি শক্তির জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ছাত্র বন্ধুটি অধ্যাপক শিবশরণ চৌধুরী, লাবণ্যলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যপকগণের বক্তৃতা হুবহু পুনরাবৃত্তি করিতে পারিতেন। এমন কি অধ্যাপক তারকব্রহ্ম চক্রবর্ত্তীর লজিকের বক্তৃতার "you see" হইতে আরম্ভ করিয়া ছেদ, পূর্ণছেদ পর্যন্ত আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে অবাক করিয়া দিতেন।

তখন ছাত্রদের মধ্যে সদ্ভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসার নিবিড় বন্ধন ছিল। নিজেদের প্রচেষ্টায় আমরা কলেজের বাহিরে খেলাধূলা ও ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা লইয়া তদ্বারা নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতাম। চরিত্র গঠন ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য। আমার অধ্যয়ন কালে এমন কোন ঘটনার কথা মনে করিতে পারিনা যেখানে ছাত্র অধ্যাপকের মধ্যে কোন বাক্-বিতন্ডা হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই সৎস্বভাব ও সচ্চরিত্রতার জন্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব এই কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের মধ্যে কখনোও দেখা যায় নাই।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। ছাত্রগণের খেলাধূলার জন্য কোন নির্দিষ্ট ভাল মাঠ পর্যন্ত ছিল না। তবু বর্ত্তমান ছাত্রগণের অপেক্ষায় তৎকালীন ছাত্রগণ স্বাস্থ্য বিষয়ে বেশী অবহিত থাকায় আপন প্রচেষ্টায় নানাবিধ খেলার ও ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজ নিজ স্বাস্থ্য গঠনের কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। আমার সময়ে হেতমপুরগ্রামে শ্রী সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় নামে আমার একজন বন্ধুস্থানীয় ছাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এরূপ স্বাস্থ্য লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সুদৃঢ় বাহুর সাহায্যে

মোটর গাড়ি অনায়াসেই আটকাইতে পারিতেন। ছাত্রগণের খেলাধূলার প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষের যথোচিত দৃষ্টি না থ
হেতমপুর রাজ পরিবারের কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের খেলাধূলা বিষয়ে উৎসাহ দানের কথা এতদঞ্চলে সুবিদিত
চেষ্টায় হেতমপুর মাঠে প্রদর্শনী ফুটবল খেলা সারা বাংলা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বহু খ্যাতনামা ফুটবল টিম
মাঠে তাঁহাদের খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন। এমনকি পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চল এই হেতমপুর মাঠেই কুমার বিশ্বরঞ্জন
মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে Islington Corinthians vs Bengal Best Ele
দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল।

কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে বক্তৃতা করিতে এবং তর্ক করিতে শিখিতে পারে তজ্জন্য মাঝে মাঝে বিতর্ক সভার আ
হইত। এই বিতর্ক সভায় যোগদান করায় একটি সুফল হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী জীবনে এই সময়কার ছাত্রগণের মধ্যে অ
সাধারণ বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া ভাল বক্তৃতা দিতে পারিতেন এবং অনেকেই বি-এ পাশ করিবার পর আইন কলেজে ভ
সমাপ্তির পর এই জেলার আদালত সমূহে ওকালতি ব্যবসার দ্বারা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যথেষ্ট মান সম্মানের অ
হইয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ ইংরাজী ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে গত ৬০ বৎসর যাবৎ বীরভূম জেলার পল্লী অ
বিদ্যাবিতরণে ও উচ্চশিক্ষা প্রসারে যে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে সারা বীরভূম জেলায়, এমনকি, পশ্চিমবাংলার অন্য
জেলার কোন কলেজের সহিত তাহার তুলনা করা চলে না। এই কলেজ স্থাপিত না হইলে বীরভূম জেলা বহুকাল অন্ধকা
থাকিত। যে মহীয়সী মহিলা এই কলেজ স্থাপন করিয়া উচ্চশিক্ষা প্রসারের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন সেই মহারাণী পদ্মসুন্দরী
চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন।

এই কলেজ স্থাপনাবধি হেতমপুর রাজপরিবারবর্গ ইহার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। এ স
কুমার বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর নাম স্মরণীয়। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই কলেজে আই-এস-সি পড়াইবার অনুমোদন লাভ করা হয়
তাঁহারই আনুকূল্যে একটি বিজ্ঞান ভবনের নির্ম্মাণকার্য্য বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যুতে এই নির্ম্মাণ
অসমাপ্ত রহিয়া যায়। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে ইহা সমাপ্ত হয়।

আমি নিজে এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি এবং কর্মজীবনে প্রবেশের অল্পকাল পরেই এই কলে
পরিচালক সমিতির সভ্য হিসাবে আমার এই প্রজ্ঞাজননীর সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া আসিয়াছি। বিহার ও পশ্চিম বাং
"জমিদারী উচ্ছেদ" আইন বলবৎ হওয়ায় এই কলেজের নানা আর্থিক অসচ্ছলতা দেখা দেয়। আজ জাতীয় সরকার কর্তৃক
কলেজ Sponsored হওয়ায় ইহার আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়াছে এবং জনসাধারণের উচ্চশিক্ষার সুদৃঢ় স্তম্ভরূপে পরি
হইয়াছে। এই কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রী সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় ও কর্মদক্ষতায় এই বৎসর হইতে বি-
সি ক্লাস খোলার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত গৃহও নির্মিত হইতেছে দেখিয়া এবং অধ্যাপকবৃন্দও এই কলে
সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছি। আমাদের এই কলেজ উত্তরোত্তর উন্নতি
করিয়া ভাবীকালের প্রকৃত মানুষ সৃষ্টির সহায়ক হইয়া বঙ্গমাতার সেবা করিতে থাকুক, - শ্রীভগবানের নিকট ইহাই আমার প্রার্থ

(পুনর্মুদ্রি

□

এই কলেজের যাঁরা অধ্যক্ষ

ডঃ যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১৮৯৭ - ১৮৯৯
অক্ষয় কুমার সেন	১৮৯৯ - ১৯০২
শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য (ভারপ্রাপ্ত)	১৯০২ - ১৯০৩
অক্ষয় কুমার সেন	১৯০৩ - ১৯০৫
রাধিকামোহন চৌধুরী	১৯০৫ - ১৯০৮
অতুলচন্দ্র সেন	১৯০৮ - ১৯১০
ধর্মদাস দত্ত (ভারপ্রাপ্ত)	১৯১০ - ১৯১১
ভূপেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত	১৯২৫ - ১৮/১১/৫৬
সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৮/১১/৫৬ - ৩/১২/৬০
গোপালগোবিন্দ মজুমদার	৪/১২/৬০ - ১৮/১১/৮৭
মহাদেব চট্টোপাধ্যায় (ভারপ্রাপ্ত)	১৯/১১/৮৭ - ১১/১২/৮৭
গোপালগোবিন্দ মজুমদার	১২/১২/৮৭ - ২৯/২/ ৮৮
ডঃ সুধাংশুকুমার চন্দ্র	১/৩/৮৮ - ২৩/১০/৯০
ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মন্ডল	২৪/১০/৯০ - ৩১/৫/৯১
ডঃ সুধাংশুকুমার চন্দ্র	১/৬/৯১ - ৬/৩/৯৪
স্বাধীন গুপ্ত	৭/৩/৯৪ -

শতবর্ষের পরিক্রমায় এই কলেজের বিশিষ্ট অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্র

	পরবর্তীকালে
অধ্যক্ষ	
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	সচিব, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
অধ্যাপক	
অধ্যাপক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার	কলেজ পরিদর্শক, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়
" অনিল বরণ রায়	স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পন্ডিচেরী আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত
ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য	উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ জ্যোতি সেনগুপ্ত	অধ্যাপক ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য নোবেল কমিটি
ডঃ হরিপদ চক্রবর্ত্তী	অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
অধ্যাপক লাবণ্যলাল মুখার্জ্জী (এল মুখার্জী)	বিশিষ্ট গ্রন্থকার
" প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত	বিশিষ্ট গ্রন্থকার
" জগদীশ্বর সান্যাল	বিশিষ্ট গ্রন্থকার
" রাসিদুল হাসান	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
" নিরঞ্জন সেন	বিশিষ্ট সাংবাদিক
" সমীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	অধ্যাপক ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়, আফ্রিকা
ডঃ জগবন্ধু মেদ্দা	কলেজ পরিদর্শক, (ভারপ্রাপ্ত), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ নিমাই প্রামানিক	অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশিষ্ট গ্রন্থকার
ছাত্র	
ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	উপাচার্য, বর্ধমান ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য, তিরুপতি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়	উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্র	পরবর্তীকালে
ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল	মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী ধীরেন সেন	মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট
কলিম শেরাফী	প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী, বাংলাদেশ
স্বরূপকৃষ্ণ গুপ্ত	চীফ্ অপারেশন ম্যানেজার, পূর্বরেল
সুস্মিতা বিশ্বাস	বিধায়ক

অন্যান্য প্রাক্তন অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মি

অধ্যাপক

শরৎকুমার সেন	কিরণমোহন চট্টোপাধ্যায়	শিবশরণ চৌধুরী
বরেন্দ্রনাথ সোম	নীরোদবরন ভট্টাচার্য	দুর্গামোহন শাস্ত্রী
তারকব্রহ্ম চক্রবর্তী	জটিলেশ্বর সরকার	মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অনাদি বরণ ব্যানার্জী	নিখিল রঞ্জন প্রচন্ড
অবিনাশচন্দ্র শাস্ত্রী	হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	গুরুদাস সরকার
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	চিন্ময় বাগচী (স্বামী চিন্ময়ানন্দ)	সত্যকালী মুখার্জী
গিরিধারী শাস্ত্রী	হৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস	সমীরকুমার মুখার্জী
সন্তোষকুমার মুখার্জী	জগজীবন রায়	পীযূষকান্তি পাল
কৌশম্বীনাথ মল্লিক	তারাপদ ভট্টাচার্য	দুলালকুমার ভট্টাচার্য
রাজা গোপালআচারী	সুভাষচন্দ্র মজুমদার	দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য
ডঃ গৌতম সিদ্ধান্ত	স্বদেশরঞ্জন চক্রবর্তী	বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য
সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী	মহাদেব চট্টোপাধ্যায়	ডঃ সনৎ সূত্রধর
দয়াময় রায়	দীপ্তিসাধন বসু	কৃষ্ণনাথ মল্লিক
ডঃ সুধাংশুকুমার চন্দ্র	ডঃ কিশোরীরঞ্জন দাস	দেবব্রত চ্যাটার্জী
ডঃ স্বপন সরকার	মধুসূদন মুখার্জী	পঙ্কজকুমার মুখার্জী
ডঃ শিশিরকুমার রায়	ডঃ সুচিত্রা সেন	সঙ্ঘমিত্রা বসু
	সুস্মিতা ভৌমিক	

শিক্ষাকর্মি

নিতাই দত্ত	কিরীটিভূষণ পাল	সঙ্কর্ষণ দত্ত
তারাদাস চ্যাটার্জী	বহুবল্লভ দাস	নারায়ণ সেন
সত্যনারায়ণ সেন	সত্যনারায়ণ ভাঁড়ারী	দুঃখহরণ হাজরা
রামকৃষ্ণ দত্ত	ষষ্ঠী বাউড়ী	শ্যামাপদ মিত্র
মানিক ভান্ডারী	নিবারণ দাস	শিবু সূত্রধর
পঞ্চানন বাউড়ী	ফণীভূষণ হাজরা	নেপাল আহির
রাধাশ্যাম ঠাকুর	সন্যাসীচরণ দে	কার্তিকচন্দ্র মুখার্জী
	রামখেলন ডোম	

গ্রন্থাগার কর্মি

অজিত পাল	অমলেশ মিত্র	অম্বিকাপ্রসাদ মুখার্জী
	বোধিসত্ত্ব শীল	

বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মিবৃন্দ

শ্রীস্বাধীন গুপ্ত

বাংলা বিভাগ

ডঃ মহম্মদ আলতাফলি — রিডার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীদেবাশিস দাশ — লেকচারার
শ্রীঅসীম চট্টরাজ — "
ডঃ আশিস্ কুমার চক্রবর্তী — "

ইংরাজী বিভাগ

শ্রীস্বপনকুমার দে — সিনিয়র লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)

সংস্কৃত বিভাগ

শ্রীবসন্তকুমার রায় — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
ডঃ রাধানাথ আচার্য — রিডার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

শ্রীপ্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীনীরদবরণ পাল — সিনিয়র লেকচারার
ডঃ সুকান্ত আচার্য (ছুটিতে) — লেকচারার
শ্রীমঙ্গলাপ্রসাদ ভট্টাচার্য — "

ইতিহাস বিভাগ

শ্রীমহম্মদ আব্দুল হাফিজ — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীরণজিতকুমার সেনগুপ্ত — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত — সিনিয়র লেকচারার

দর্শন বিভাগ

শ্রীমতি স্বস্তিকা ভট্টাচার্য — সিনিয়র লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীমতি কৃষ্ণা চৌধুরী — সিনিয়র লেকচারার

অর্থনীতি বিভাগ

শ্রীগুণধর মন্ডল — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীঅনির্বান বিশ্বাস — সিনিয়র লেকচারার

গণিত বিভাগ

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীকৃষ্ণকুমার মন্ডল — লেকচারার
ডঃ দেবনারায়ণ মুখার্জী — লেকচারার

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার চন্দ্র — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
শ্রীদীপক কুমার সিনহা — সিলেকসন গ্রেড লেকচারার
ডঃ অমিয়ভূষণ বিশ্বাস — সিনিয়র লেকচারার
ডঃ প্রণবানন্দ মন্ডল — লেকচারার
শ্রীসুনীলকুমার দত্তমুদি — ডেমনষ্ট্রেটর
শ্রীপরমানন্দ দত্ত — ল্যাব ইনস্ট্রাক্টর

অধ্যক্ষ

শ্রীষষ্ঠীধর মন্ডল

ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মন্ডল
ডঃ কল্যাণকুমার পাল
শ্রীষষ্ঠীগোপাল সাহা
সৈয়দ সাজেদ আলি
শ্রীপবিত্রকুমার সরকার

ডঃ তরুণকুমার দাশ
ডঃ আমিনুল ইসলাম

ডঃ বিদ্যুৎকুমার রায়
ডঃ অশোককুমার মল্লিক

শ্রীমহম্মদ ঈশা

রসায়ন বিভাগ

সিলেকসন গ্রেড লেকচারার (বিভাগীয় প্রধান)
রিডার
"
সিলেকসন গ্রেড লেকচারার
ডেমনষ্ট্রেটর (পুনর্নিয়োগ প্রার্থী)
ল্যাব ইনস্ট্রাকটর

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

রিডার (বিভাগীয় প্রধান)
সিনিয়র লেকচারার (বিশিষ্ট গ্রন্থকার)

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

রিডার (বিভাগীয় প্রধান)
সিনিয়র লেকচারার

গ্রন্থাগারিক

শিক্ষাকর্মি

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় — হেড ক্লার্ক
শ্রীনরেন্দ্রনাথ গুপ্ত — ক্লার্ক
শ্রীমোহনলাল দত্ত — ক্লার্ক ও টাইপিস্ট
শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায় — ক্যাশিয়ার
শ্রীতেলারাম হাজরা — শিক্ষাকর্মি
শ্রীমানিকচন্দ্র চক্রবর্তী — "
শ্রীধর্মদাস চট্টোপাধ্যায় — "
শ্রীকান্ত দাস — "
শ্রীঅনাদি মুখার্জী — "
শ্রীনারায়ণচন্দ্র সালুই — "
শ্রীশিবু বিশ্বাস — "
শ্রীসুধীরকুমারদাস — "
শ্রীক্ষীরোদ ভান্ডারী — "
শ্রীপরিমলকুমার ঠাকুর — "
শ্রীমতি সুমিতা ঘোষ — "
শ্রীসীতারাম আচার্য — "
শ্রীমতি দুর্গা মল্লিক ডোম — "
শ্রীধরম দেও আহির — "
শ্রীদিলীপকুমার ভট্টাচার্য — "
শ্রীসিদ্ধুময় চট্টরাজ — "
শ্রীবরমদেও আহির — "
শ্রীগৌসাই চন্দ্র দাস — "
শ্রীশরৎকুমার পাল — "
শ্রীসুখেন বাউড়ি — "

Krishna Chandra College
Central Library
Hetampur, Birbhum

বর্তমান পরিচালক সমিতি

শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল, সমবায় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,	সভাপতি
শ্রী মাধবীরঞ্জন চক্রবর্তী / শ্রী সুরঞ্জন চক্রবর্তী	দাতা
অধ্যাপক প্রেমপ্রকাশ চক্রবর্তী	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি
অধ্যাপিকা অলকা সিদ্ধান্ত	,,
শ্রী বৈদ্যনাথ মন্ডল	,,
অধ্যাপক মহঃ আব্দুল হাফিজ	শিক্ষক প্রতিনিধি
অধ্যাপক নীরোদবরণ পাল	,,
ডঃ অমিয়ভূষণ বিশ্বাস	,,
শ্রী সিন্ধুময় চট্টরাজ	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি
শ্রীকান্ত দাস	,,
মহঃ হাফিজুর রহমান	ছাত্র প্রতিনিধি
অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত	সম্পাদক

বর্তমান ছাত্র সংসদ

অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত	সভাপতি
মহঃ সহিদুল ইসলাম	সহ-সভাপতি
মহঃ হাফিজুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক
শ্রীঅংশুমান দে	সহ-সাধারণ সম্পাদক
,, ফাল্গুনী পাল	সাংস্কৃতিক সম্পাদক
মহঃ মেজানুল হক	সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক
শ্রী জয় সরকার	ক্রীড়া সম্পাদক
,, মনোজ দত্ত	সহ-ক্রীড়া সম্পাদক
কবিরুল ইসলাম	পত্রিকা সম্পাদক
শ্রী দেবাশিস মিশ্র	সহ-পত্রিকা সম্পাদক
,, কাঞ্চন মাজি	সম্পাদক বিজ্ঞান পরিষদ
,, সৌমেন মিত্র	সহ-সম্পাদক ,, ,,
,, নির্মল চট্টোপাধ্যায়	সম্পাদক, ছাত্রকল্যাণ ও সমাজসেবা
,, অসীম সৌ মন্ডল	সহ-সম্পাদক ,, ,,
,, পার্থ ব্যানার্জী	সম্পাদক, ছাত্র কমন রুম
মহঃ ফিরোজ	সহ-সম্পাদক ,, ,, ,,
লিপিকা দে	সম্পাদিকা, ছাত্রী কমন রুম
সুলেখা পাল	সহ-সম্পাদিকা ,, ,, ,,

সদস্য

মানস গুপ্ত, পার্থ চ্যাটার্জী, শ্যামল চন্দ্র দাস, সনাতন মুখার্জী, শাহজাহান, পরিমল রায়, তরুণ কান্তি দাস, বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ, কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্ত আশ, মহঃ মহসীন, দীপন কুমার মিশ্র, সুচিত্রা দত্ত, অনুপ কুমার ঘোষ, ফরিয়াদ হোসেন খান, আশীষ কুমার ঘোষ, শাহ আবু বরকত হাবিবুল্লা, সেখ আসরফ আলি, সেখ তাজউদ্দিন, [illegible] চ্যাটার্জী, দূর্বা পাল, পার্থসারথি চক্রবর্তী, অনিল ভান্ডারী, তাপসী দত্ত, চিরন্তন মিশ্র, সৌরভ কুমার মন্ডল,